POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى
رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসুলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পোঁছাইয়া দেওয়া।

(মায়েদা: ৯৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 45
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

11 নভেম্বর , 2021 ● 5 রবিউল সানি 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যাচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

১৪৮০) হযরত উমর (রা.) বলেন-হে রসুলুল্লাহ (সা.) আপনি আমার নিকট সব থেকে বেশি প্রিয়, শুধু আমার প্রাণ ছাড়া। আঁ হযরত (সা.) বলেন, না। সেই সত্তার নামে শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। (ঈমান ততক্ষণ পূর্ণ হতে পারে না) যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় না হই। উমর (রা.) বলেন- খোদার কসম! আপনি এখন আমার নিকট আমার প্রাণের থেকেও বেশি প্রিয়। আঁ হযরত (সা.) বললেন, হ্যাঁ, এখন তোমার ঈমান পূর্ণ হল।

সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা

১৪৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া সদকা হিসেবে দেন। অতঃপর তিনি সেটিকে বিক্রি হতে দেখে নিজেই কিনে নিতে চান। তিনি (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, নিজের সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নিও না।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৮ অক্টোবর, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত সিঙ্গাপুর, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),
প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)
হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ

আমি নিজ জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আত্মশ্লাঘা থেকে বিরত হও। কেননা এটি আমাদের সম্মানিয় খোদার দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমি নিজ জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আত্মশ্লাঘা থেকে বিরত হও। কেননা এটি আমাদের সম্মানিয় খোদার দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মশ্লাঘা কি তা হয়তো তোমরা অনুধাবন করতে পারবে না। অতএব আমার কাছে জেনে নাও, কেননা আমি খোদার ফিরিশতাদের মাধ্যমে কথা বলি।

প্রত্যেক সেই ব্যক্তি দাম্ভিক যে আপন ভাইকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, কারণ তার থেকে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বা কাজে অধিক নিপুন। কেননা, সে খোদাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির উৎস হিসেবে মনে করে না এবং নিজেকে নিয়ে অহংকার করে। তাকে উন্মাদ বানিয়ে দেওয়ার এবং তার সেই ভাইকে যাকে অবজ্ঞা করে, তাকে তার থেকে উত্তম জ্ঞান বুদ্ধি ও দক্ষতা প্রদানের শক্তি কি খোদা তা'লার নেই? অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তিও অহংকারী, যে নিজের সম্পদ ও প্রভাবপত্তির কারণে আপন ভাইকে অবজ্ঞা করে। কেননা, সে ভুলে গিয়েছে যে সম্পদ ও বৈভব খোদা তা'লাই তাকে দান করেছিলেন। এমন ব্যক্তি অন্ধ। সে জানেনা যে, খোদা তা'লা তাকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে 'আসফালাস সাফেলীন;- এ নিক্ষেপ করার এবং তার অবজ্ঞার পাত্র ভাইটিকে তার থেকে উত্তম ধন-সম্পদ দান করার শক্তি রাখেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নিজ সুস্বাস্থ্য নিয়ে গর্ব করে কিম্বা নিজ সৌন্দর্য ও বাহুবলের অহংকারে মত্ত থাকে আর নিজ ভাইকে নিয়ে উপহাস করে, তাকে ব্যঙ্গাত্মক নামে ডাকে, তার শরিরিক দোষত্রুটির কথা লোকের সামনে বলে বেড়ায়, সেও অহংকারী। এমন ব্যক্তি সেই খোদা সম্পর্কে উদাসীন যিনি এক লহমায় তার শারিরিক ত্রুটি এনে দিতে পারেন যা তাকে তার ভাইয়ের থেকে কুৎসিত করে দেয় যাকে অবজ্ঞা করা হত। এবং সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তার শক্তিবৃত্তির মধ্যে এমন বরকত দান করেন যা ক্ষয় হয় না। কেননা তিনি যা চান তাই করেন। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তিও অহংকারী যে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে দোয়া যাচনা করার বিষয়ে আলস্য প্রদর্শন করে। কেননা সকল শক্তিবৃত্তির উৎসমুখ (খোদাকে) কে সে সনাক্ত করে নি এবং নিজেকে নিয়ে গর্ব করেছে।

হে স্নেহবর! তোমরা এই সব কথাগুলি স্মরণ রেখো। পাছে তোমরা কোনও দৃষ্টিকোণ থেকেও খোদার দৃষ্টিতে অহংকারী সাব্যস্তহ হও, অথচ তুমি সে সম্পর্কে উদাসীন থাক। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন ভুল কথাকে অহংকারপূর্ণ পন্থায় সংশোধন করে, তার মধ্যেও অহংকার রয়েছে। যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না, মুখ ফিরিয়ে নেয়, সেও অহংকারী। যে ব্যক্তি প্রার্থনাকারীকে নিয়ে বিদ্রুপ করে,সেও অহংকারী। আর যে ব্যক্তি খোদার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের পূর্ণ আনুগত্য করে না,সেও অহংকারী। আর যে তাঁর কথা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনে না,সেও অহংকারী । কাজেই চেষ্টা কর যাতে অহংকারের কোন অংশ তোমাদের মধ্যে না থাকে। যাতে তোমরা ধ্বংস না হও। এবং পরিবার পরিজন সহ পরিত্রাণ পাও।

(নুযুলুল মসীহ, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪০২)

রসুলুল্লাহ (সা.) এই সুন্নত প্রতিষ্ঠিত করেন যে, মুসলমানেরা সমস্ত কাজ বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করবে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)বিসমিল্লাহ-র কল্যাণ সম্পর্কে বলে-

বিসমিল্লাহ্‌র কল্যাণ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সা.) বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, যে বড় কাজ বিসমিল্লাহ ছাড়া আরম্ভ করা হয়, তাতে বরকত থাকে না। রসুলুল্লাহ (সা.) এই সুন্নত প্রতিষ্ঠিত করেন যে, মুসলমানেরা সমস্ত কাজ বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে - দরজা বন্ধ করার সময়ও বিসমিল্লাহ পাঠ কর। আর প্রদীপ নেভানোর সময়ও বিসমিল্লাহ পাঠ কর। পাত্র ঢাকার সময়ও বিসমিল্লাহ পাঠ কর। এবং থলের মুখ বাঁধার সময়ও। অনুরূপভাবে স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময়ও বিসমিল্লাহ পাঠ কর, এবং ওজু করার সময় এবং খাওয়ার সময়ও এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার সময়ও। কাপড় পরার সময়ও বিসমিল্লাহ পড়ার বিষয়টি অন্য একটি হাদীস থেকে প্রমাণিত। কুরআন করীমে হযরত সুলেমান এর একটি চিঠির উল্লেখ করা হয়েছে। তিনিও বিসমিল্লাহ দিয়ে নিজের চিঠি শুরু করেছেন। ..... অর্থাৎ এই চিঠি সুলেমানের পক্ষ থেকে এবং বিসমিল্লাহ্ দ্বারা আরম্ভ হচ্ছে। হযরত নূহ (আ.)-এর উল্লেখও করা হয়েছে। তিনিও নৌকাতে সওয়ার সময় তাঁর সঙ্গীদেরকে ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(তফসীরে কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(মিথ্যা বলার বৈধতা সংক্রান্ত) উত্তরের শেষাংশ) যদি ধরেও নেওয়া হয় যে কোনও হাদীস কুরআন এবং সহীহ হাদীসের পরিপন্থী, তবে সে ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আমরা কেবল সেই সব হাদীসকেই গ্রহণ করি যেগুলি কুরআন করীম এবং সহী হাদীসের পরিপন্থী নয়।

একজন নির্বোধ যখন এমন শব্দ কোন হাদীসে দ্ব্যর্থক ভাষায় লেখা দেখে তখন তারা হয়তো সেটিকে সত্যিকার মিত্যা মনে করে বসে। কেননা তারা ইসলামের সেই অমোঘ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উদাসীন যেখানে বলা হয়েছে সত্যিকার মিথ্যা ইসলামে কলুষ, অবৈধ এবং শিরকের সমতুল্য। ..... কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে মিথ্যা বলে মনে হলেও হাদীসে নিতান্ত অপারগতার ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থক ভাষা ব্যবহারে বৈধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও লেখা আছে যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে এই দ্ব্যর্থক ভাষা ব্যবহার থেকেও বিরত থাকে। এছাড়া অন্যান্য অনেক এমন হাদীসও রয়েছে যা থেকে জানা যায় যে দ্ব্যর্থকভাষার ব্যবহার উচ্চাঙ্গীন তাকওয়ার পরিপন্থী এবং অবশ্যই খোলাখুলি সত্য কথা উত্তম, এর জন্য কাউকে হত্যাও করা হলে বা পুড়িয়ে ফেলা হলে। ”

(নুরুল কুরআন, নম্বর-২, রুহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪০৩-৪০৫)

অতএব, একথা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় যে হাদীসে মিথ্যা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই কারণে সেই সব হাদীসের ব্যাখ্যা হতে পারে যেগুলি কুরআন ও সুন্নত অনুসারে টিকে থাকবে।

প্রশ্ন: সুন্নত নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সুরা ফাতিহার পর অন্য কিছু সুরা পড়ার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা চান। যার উত্তরে হুযুর আনোয়ার ২০১৯ সালের ১৪ মার্চ তারিখের চিঠিতে বলেন-হাদীসে যেভাবে ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার পর কুরআন করীমের কিছু অংশ পড়ার উপর জোর দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেভাবে হাদীসে, বিশেষ করে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে কোথাও স্পষ্টীকরণ নেই যে সুন্নতের চারটি রাকাতে সুরা ফাতিহার পর কুরআনের কিছু অংশ অবশ্যই পড়তে হবে।

ফিকাহবিদদের মধ্যেও এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। মালিকি এবং হাম্বলি পন্থীরা সুন্নতের প্রতিটি রাকাতে সুরা ফাতিহার পর কুরআন করীমের কিছু অংশ পড়ে থাকে। অপরদিকে হানাফি এবং শাফিরা তৃতীয় ও চতুর্থ রাকতে সুরা ফাতিহার পর কুরআনের কোন অংশ পাঠ করে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ)-এর মতে এ বিষয়ে ফরয ও সুন্নত নামাযের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যেভাবে ফরয নামাযের কেবল দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার পর কুরআন করীমের কিছু অংশ পাঠ করা হয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে কেবল সুরা ফাতিহা পড়ার বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে, আর আমারও অবস্থান একই।

প্রশ্ন: সম্প্রতি কোন এক দেশে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা শাস্তি ক্রিয়ান্বিত করার কথা উল্লেখ করে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, বর্তমান যুগেও কি এই শাস্তি ক্রিয়ান্বিত করা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৯ সালের ১৪ই মার্চ তারিখের চিঠিতে উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেন-

ইসলামের শিক্ষামালায় শাস্তি প্রদানেরও বিধান রয়েছে, আর তা কোন বিশেষ যুগ বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এক বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী বিধান। কিন্তু ইসলামী দণ্ড বিধানের বিষয়ে একথাটি সব সময় দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, সাধারণত এর দুটি আঙ্গিক রয়েছে। একটি হল চরম শাস্তি এবং অপরটি হল অপেক্ষাকৃত কম শাস্তি। আর শাস্তিদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্য হল অপরাধ দমন করা এবং অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

কাজেই ব্যাভিচার যদি উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে আর তা ইসলামি সাক্ষ্য প্রদানের পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়, তবে উভয়কে একশ বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদানের আদেশ রয়েছে। কিন্তু যে ব্যাভিচারের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা হয় এবং অত্যন্ত বর্বরোচিত অত্যচারের সাক্ষর থাকে বা কোন ব্যাভিচারী শিশু ধর্ষনের ন্যায় জঘন্য অপরাধ করে, সেক্ষেত্রে ব্যাভিচারীর শাস্তি শুধু একশ বেত্রাঘাত হতে পারে না। এমন ধর্ষককে কুরআন করীমের সূরা মায়েদার ৩৪ নং আয়াত এবং সূরা আহযাবের ৬১-৬৩ নং আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার ভিত্তিতে হত্যা অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যার চরম শাস্তিও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই শাস্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ক্ষমতাসীন সরকারকে দেওয়া হয়েছে আর এই শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণভাবে শাসন ব্যবস্থার জন্য একটি পথ খোলা হয়েছে।

প্রশ্ন: জনৈক আহমদী একত্রে তিন তালাক প্রদান, ক্রোধের বসে দেওয়া তালাক এবং তালাকের জন্য সাক্ষীর বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৯ সালের ১লা জুন তারিখের চিঠিতে লেখেন-

যখন কেউ নিজ স্ত্রীকে সজ্ঞানে তালাক দেয়, লিখিত হোক বা মৌখিক, উভয় ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে। তবে একই সময়ে তিন বার দেওয়া তালাক একটি তালাক হিসেবে গণ্য হবে। হাদীসের গ্রন্থসমূহে হযরত রুকানা বিন আবদে ইয়াযিদ=এর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিয়েছিলেন, পরে তিনি এ নিয়ে আক্ষেপ করেন। বিষয়টি যখন আঁ হযরত (সা.) এর কাছে এসে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, ‘এভাবে একটি মাত্র তালাক হয়, তুমি চাইলে প্রত্যাবর্তন করতে পার।’ একথা শুনে তিনি তালাক ফিরিয়ে নেন এবং এরপর তিনি সেই স্ত্রীকে হযরত উমর (রা.)-এর যুগে দ্বিতীয় এবং হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে তৃতীয় তালাক দেন।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, বাব ফিল বাত্তাতে)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, ‘একই সময়ে তালাক সম্পূর্ণ হয়না। তালাকে তিন ‘তোহর’ (ঋতুস্রাবমুক্ত সময়কাল) আবশ্যক শর্ত। ফিকাহবিদরা একত্রে তিন তালাক দেওয়াকে বৈধ হিসেবে গণ্য করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে অব্যহিতও দেওয়া হয়েছে যে, ইদ্দতের পর স্বামী যদি তালাক ফিরিয়ে নিতে চায়, তবে স্ত্রী সেই স্বামীকেই নিকাহ করতে পারে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গেও নিকাহ করতে পারে।”

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭)

অনরূপভাবে কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক দেয় তার কোন অসহনীয় এবং অন্যায্য কোন আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে। স্ত্রীর প্রতি প্রীত থেকে কোন ব্যক্তিকে তালাক দেয় না। তাই ক্রোধান্বিত অবস্থায় দেওয়া তালাকও সমানরূপে কার্যকরী হবে। তবে যদি কোন ব্যক্তির ক্রোধ উন্মাদনার পর্যায়ে পৌছে যায় আর সে পরিণতির কথা না ভেবেই তাড়াহুড়ো করে স্ত্রীকে তালাক দেয়, অতঃপর ক্রোধ প্রশমিত হলে অনুতপ্ত হয়, নিজের ভুল বুঝতে পারে- এমন পরিস্থিতির জন্য কুরআন করীম ঘোষণা করেছে-

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের বৃথা শপথগুলির জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন উহার জন্য যাহা তোমাদের অন্তর সংকল্পপূর্বক অর্জন করিয়াছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

(সূরা আল বাকারা: ২২৬)

তালাকের জন্য সাক্ষ্যদানের বিষয়টি রয়েছে, যাতে বিবাদ হওয়ার পরিস্থিতিতে মীমাংসা করতে সহজ হয়। কিনতু যদি স্বামী স্ত্রী তালাক ক্রিয়ান্বিত হওয়ার বিষয়ে একমত থাকে, তাদের মধ্যে কোন মতভেদ না থাকে, তবে সাক্ষী ছাড়াও এমন তালাক ক্রিয়ান্বিত হবে। কাজেই তালাকের জন্য সাক্ষী থাকা উপযোগী বটে, কিন্তু আবশ্যক নয়। কুরআন করীম তালাক এবং তালাক ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে যেখানে সাক্ষীর কথা উল্লেখ করেছে, সেখানে উপদেশও দান করেছে। যেমনটি এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে-

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

অর্থাৎ অতঃপর যখন তাহারা তাহাদের নির্ধারিত ইদ্দতের শেষ সীমায় উপনীত হয় তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ন্যায়-সঙ্গতভাবে রাখ অথবা তাহাদিগকে ন্যায়-সংগতভাবে বিদায় করিয়া দাও, এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ, এবং আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কর। সেই ব্যক্তিকে এই উপদেশ দান করা হইতেছে যে আল্লাহ্র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে। এবং যে আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করে= যিনি তাহার জন্য কোন না কোন উদ্ধারের পথ করিয়া দিবেন।

(সূরা তালাক, আয়াত: ৩)

অতএব চার ফিকাহবিদও এ বিষয়ে ঐক্যমত যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন সাক্ষী ছাড়াও তালাক দেয় বা তালাক ফিরিয়ে নেয়, তবে সেক্ষেত্রে তালাক বা প্রত্যাবর্তনের উপর কোন প্রভাব পড়বে না।

প্রশ্ন: কুরআন করীম তিলাওয়াতের পর ‘সাদাকাল্লাহুল আযীম’ পড়ার বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের কাছে দিক-নির্দেশনা চান। হুযুর আনোয়ার ১১ই জুন, ২০১৯ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

আমি বিষয়ে গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। উলেমাদের মধ্যে দুই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। যারা এর বৈধতার বিষয়ে বিশ্বাসী, তারা কয়েকটি কুরআনী আয়াত এবং হাদীস থেকে এর বৈধতার প্রমাণ বের করেছে।

আমার মতেও এই শব্দবন্ধন ব্যবহার করলে অসুবিধার কিছু নেই। কেননা এতে খারাপ কথা তো মোটেই নেই, আল্লাহ্ তা’লার বাণী সত্যি হওয়ার বিষয়ে সত্যায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু এই শব্দ বন্ধনের অর্থ না জেনে কেবল একটি প্রথা হিসেবে এর পুনরাবৃত্তি করা নিরর্থক হিসেবে গণ্য হবে।

(ক্রমশ....)

জুমআর খুতবা

হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খেলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের গণ্ডি দূর-দূরান্তের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুসলিম সাম্রাজ্য পূর্বে জিহুন এবং সিন্ধু নদ থেকে নিয়ে পশ্চিমে আফ্রিকার ধূসর মরুভূমি পর্যন্ত আর উত্তরে এশিয়া মাইনরের (অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত তৎকালীন সাইলেসিয়া প্রদেশ) পাহাড় ও আর্মেনিয়া থেকে নিয়ে দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর এবং নুবিয়া পর্যন্ত একটি বিশ্বময় বিস্তৃত দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ৮ অক্টোবর ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৮, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উমর (রা.)-এর যুগের বিজয়াভিযানের আলোচনা অব্যাহত আছে। হযরত উমর (রা.)-এর জীবনীকার আল্লামা শিবলী নো'মানী হযরত উমর (রা.)-এর বিজয়সমূহ এবং বিজয়ের কারণ ও নেপথ্য-কাহিনীর উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন: একজন ঐতিহাসিকের হৃদয়ে স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগবে যে, মুষ্টিমেয় মরুবাসী কীভাবে পারস্য এবং রোমান সম্রাটের সিংহাসন উল্টে দিল?

এটি কি পৃথিবীর ইতিহাসের কোন ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ছিল? এসব জয়ের নেপথ্যে কারণ কী ছিল? এসব বিজয় কি সেকেন্দার এবং চেঙ্গিস খানের বিজয়ের সাথে তুলনা করা যায়? যা কিছু ঘটেছে এতে আদেশ দেয়ার মালিক খলীফার ভূমিকা কতটুকু? এক্ষেত্রে আমরা ঐসকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া আবশ্যক কিন্তু সংক্ষেপে এটি বলাও আবশ্যক যে, হযরত ওমর ফারুকের বিজয়ের ব্যাপ্তি এবং এর চতুঃসীমার বিস্তৃতি কোন্ পর্যন্ত ছিল। হযরত উমর (রা.)-এর অধিকৃত দেশসমূহের মোট আয়তন বাইশ লক্ষ একান্ন হাজার ত্রিশ বর্গমাইল। অর্থাৎ পবিত্র মক্কা নগরী থেকে উত্তর দিকে এক হাজার ছত্রিশ মাইল, পূর্ব দিকে এক হাজার সাতাশি মাইল এবং দক্ষিন দিকে চারশত তিরাশি মাইল ছিল। এই সব বিজয় ছিল মূ লত হযরত উমর (রা.)-এর বিজয় আর এসব ঘটেছে সর্বমোট দশ বছরের কিছু বেশি সময়ে। ইতিহাসের বরাতে এতক্ষণ আমি যা তুলে ধরলাম, ঐসকল বিজয়ের কারণগুলো বুঝতে গেলে এ প্রেক্ষাপট জানা আবশ্যক। যাহোক, এখন আমি ঐসকল বিজয়ের বিষয়ে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতামত বর্ণনা করছি। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, তৎকালীন পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্য তাদের শৌর্যবীর্য হারিয়ে বসেছিলঅর্থাৎ তারা তাদের উন্নতির চরম মার্গে পৌঁছে গিয়েছিল। আর ঐশী তকদীর অনুযায়ী সেখান থেকে তাদের পতন হওয়ার-ই ছিল। এরপর তারা বলেন, পারস্যে খসরু পারভেজের পর রাজ্য-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল কেননা সরকার পরিচালনার যোগ্য কোন ব্যক্তি তখন ছিল না। দরবারের হর্তাকর্তা এবং সভাসদদের মাঝে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর এই ষড়যন্ত্রের ফলে ক্ষমতার হাতবদল হতো। মোটকথা তিন-চার বছরের মাঝেই ক্ষমতার বাগডোর ছয় থেকে সাত জন শাসকের হাতে আসে আর বেরিয়ে যায়। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা বলেন, এর আরও একটি কারণ ছিল, নওশেরওয়াঁ র কিছু পূর্বে মায্দাকিয়া ফির্কার দুরন্ত উত্থান হয় যারা নাস্তিক্য ও যিন্দিক্যের প্রতি ঝুঁকে ছিল। [ইসলামের মৌলিক ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক ধারণা রাখে এমন লোকদের জন্য মুসলমানরা 'যিন্দিক' শব্দটি ব্যবহার করত। এছাড়া ম্যানচাইয়ান, জরাথুষ্টিয়ান, ধর্মত্যাগী,কাফের এবং ইসলাম বিরোধী কিছু দার্শনিককে মুসলমানরা 'যিন্দিক' বলে অভিহিত করত। কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মান্ধ বুঝাতেও 'যিন্দিক' শব্দ ব্যহার করা হয় উইকিপিডিয়া দ্রষ্টব্য] এই ফির্কার বিশ্বাস ছিল, মানুষের হৃদয় থেকে লোভ এবং অন্যান্য মতভেদ দূর করা উচিত এবং নারীসহ সমস্ত সহায় সম্পত্তিকে এজমালী সম্পত্তি আখ্যা দেওয়া উচিত (তথা তখন মহিলাদের কোন সম্মান ছিল না) যেন ধর্ম পাক-পবিত্র হয়ে যায়। এই ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। অনেকের দৃষ্টিতে এটি ছিল সামাজিক আন্দোলন যার উদ্দেশ্য ছিল জরাতুশ্ত ধর্মকে পরিশোধন করা। নওশেরওয়াঁ অস্ত্রবলে এই ধর্ম দমন করলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হন নি। ইসলাম যখন পারস্যে গিয়ে উপনীত হল, তখন এই ধর্মের অনুসারীরা মুসলমানদেরকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে পৃষ্ঠপোষক মনে করল যে, ইসলাম অন্য কোন ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আগ্রাসী নয়। এই ছিল ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকদের মতামত।

এরপর তারা লেখেন, খ্রিষ্টানদের মাঝে নেস্টোরিয়ান ফির্কা, যারা অন্য কোন দেশে আশ্রয় পেত না, তারা ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়ে বিরোধীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়। এভাবে সহজেই দু'টি বৃহৎ সম্প্রদায়ের সহমর্মিতা ও সাহায্য-সহযোগিতা মুসলমানদের হস্তগত হয়। রোমান সাম্রাজ্য স্বয়ং দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একইসাথে সে সময় খৃষ্টানদের পারস্পরিক মতবিরোধ তুঙ্গে ছিল। আর যেহেতু সে সময় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ধর্মীয় হস্তক্ষেপ ছিল, এজন্য এই মতবিরোধের প্রভাব কেবলমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এই কারণে স্বয়ং সাম্রাজ্য ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। আল্লামা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের এই অভিমতের অপনোদন করেতে গিয়ে বর্ণনা করেন যে, যদিও এই উত্তর বাস্তবতা বিবর্জিত নয় কিন্তু বাস্তবতার চেয়ে যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অতিশায়োক্তি বৈ কিছু নয়, যা ইউরোপের একটি বিশেষ রীতি। নিঃসন্দেহে সে সময় পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য ক্ষমতার তুঙ্গে ছিল না, কিন্তু এর পরিণামে তারা হয়তো কোন শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মোকাবিলা করার সামর্থ্য রাখতো না; এটি নয় যে আরবের ন্যায় দুর্বল জাতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। রোমান ও পারসীরা রণকৌশলে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। গ্রীসে বিশেষ রণকৌশল সম্পর্কিত যে সকল পুস্তকাদি রচিত হয়েছিল এবং যা এখনও বিদ্যমান আছে, রোমানদের মধ্যে একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এর ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচলন ছিল। একইসাথে রসদসামগ্রীর প্রাচুর্যতা ছিল, দ্রব্যসামগ্রীর আধিক্য ছিল, বিভিন্ন প্রকারের সমরাস্ত্র ছিল, সৈন্যসংখ্যায়ও কোন প্রকারের স্বল্পতা আসে নি আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, কোন দেশ অতিক্রম করার প্রয়োজন ছিল না, বরং নিজ দেশে, নিজস্ব দু র্গে, আপন ঘাঁটিতে থেকে নিজ দেশকে সুরক্ষা করতে হত। মুসলমানদের আক্রমণের স্বল্পকাল পূর্বে খসরু পারভেজের রাজত্বকালে, যা ইরানের শৌর্যবীর্য ও আভিজাত্যের স্বর্ণালী যুগ ছিল, রোমান সম্রাট ইরানের ওপর আক্রমণ করে এবং প্রতি পদক্ষেপে ক্রমাগত বিজয় লাভ করে 'ইসফাহান' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সিরিয়ার প্রদেশসমূহ যা ইরানীরা ছিনিয়ে নিয়েছিল সেগুলো পুন রুদ্ধার করে এবং নতুনরূপে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। ইরানে সাধারণভাবে এটি স্বীকৃত বিষয় যে, খসরু পারভেজ পর্যন্ত (ইরানী) সাম্রাজ্যের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। খসরু পারভেজের মৃত্যুকাল থেকে মুসলমানদের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত সময় ছিল মাত্র তিন-চার বছর। এত স্বল্প সময়ে একটি জাতি ও প্রাচীন সাম্রাজ্য কতটুকু -ই বা দুর্বল হতে পারে? অবশ্য শাসকদের পরিবর্তনের ফলে ব্যবস্থাপনায় পার্থক্য এসেছিল। কিন্তু যেহেতু রাজ্যের পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগে যেমন ধনভাণ্ডার, সৈন্যসংখ্যা ও কর আদায়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ঘাটতি আসে নি, এজন্য যখন ইয়াযদ্যারদ ক্ষমতায় আসীন হয় এবং সভাসদরা সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে তখন অতিদ্রুততার সাথে পুনরায় সেই জাঁকজমক ফিরে আসে। মুযদাকিয়াহ সম্প্রদায় যদিও ইরানে বিদ্যমান ছিল, তথাপি

সমগ্র ইতিহাসে তাদের পক্ষ হতে কোন প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা লাভের কথা জানা যায় না। অর্থাৎ মুসলমানরা কোন সাহায্য লাভ করেছে (তা পরিলক্ষিত হয় না)। তদ্রুপ নাসতুরী সম্প্রদায়েরও কোন প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা করার বিষয়ে আমাদের জানা নেই। নাসতুরী একটি খৃষ্টান ফিরকা যাদের ধর্মবিশ্বাস ছিল, হযরত ঈসা (আ.)-এর সত্ত্বায় ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব পৃথক পৃথক বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টানদের পারস্পরিক ধর্মীয় মতবিরোধের প্রভাব সম্পর্কে স্বয়ং ইউরোপের ইতিহাস বিদরা কোন ঘটনা প্রসঙ্গেও কোথাও বর্ণনা করে নি।

এখন আরবদের অবস্থা দেখুন! পুরো সৈন্যবাহিনী যারা মিশর, ইরান ও রোমানদের সাথে যুদ্ধে রত ছিল, তাদের মোট সংখ্যা কখনও এক লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছায় নি। রণকৌশল সম্পর্কিত জ্ঞানের অবস্থা দেখুন, ইয়ারমুকের যুদ্ধেই সর্বপ্রথম আরবরা তাবিয়্যাহ্ রীতি অনুযায়ী সারি বিন্যাস করে। তাবিয়্যাহ হচ্ছে যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীর এমন সারি বিন্যাস যেখানে সেনাপতি বা বাদশাহ্, যিনি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন, তিনি সেনাবাহিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকেন এটিকে তাবিয়্যাহ্ বিন্যাস বলে।শিরস্ত্রাণ, লৌহবর্ম, বর্ম (লোহা বা ইস্পাতনির্মিত পোশাক), জোশান (এক প্রকারের লৌহবর্ম), সাজোয়া, চার আয়না অর্থাৎ ইস্পাতের চারটি প্লেট যা বক্ষে, পিঠে ও দুই উরুতে বাঁধা হতো, লোহার মোজা, ঝিলাম (শিরস্ত্রাণ-এ লাগানো লোহার কড়া বা নিকাব), মোজা- যা প্রত্যেক ইরানী সৈন্যের আবশ্যকীয় যুদ্ধ পোশাক ছিল। এর মধ্যে আরবদের নিকট শুধুমাত্র বর্ম ছিল, আর তা-ও অধিকাংশ চামড়ার হতো। প্রতিপক্ষের সমগ্র নিরাপত্তাজনিত সাজ-সরঞ্জাম লোহার হতো আর আরবদের নিকট যদি কিছু থেকেও থাকতো তবে তা চামড়ার হতো। রিকাব (উট বা ঘোড়ার জিনের সাথে লাগানো আংটা) লোহার পরিবর্তে কাঠের হতো।যুদ্ধাস্ত্রের মাঝে লৌহগদা ও ফাঁদ সম্বন্ধে আরবরা একেবারে অজ্ঞ ছিল। লৌহগদা একটি হাতিয়ারের নাম যা উপরের দিকে গোল ও মোটা এবং নিচে হাতল লাগানো থাকে যা দ্বারা শত্রুর মাথায় আঘাত করে। কমান্দ হল ফাঁদ বা জাল বা রশি। আরবদের কাছে তির ছিল, কিন্তু এত ছোট এবং নিম্নমানের ছিল যে, কাদিসিয়ার যুদ্ধে ইরানীরা যখন প্রথম প্রথম আরবদের তির দেখল তখন সেগুলোকে এক প্রকার লৌহ দণ্ড এবং বড় সুঁই মনে করল। লেখক আল্লামা সাহেব তাদের প্রকৃত কারণ বর্ণনা করে লিখেন যে, আমাদের কাছে এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কেবল এতটুকু যে, মুসলমানদের মাঝে সেই সময় মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে যে উদ্দীপনা, দৃঢ়সংকল্প, প্রত্যয়, অবিচলতা, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং যাকে হযরত উমর (রা.) আরও শক্তিশালী এবং দৃঢ় করে তুলেছিলেন যে, রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্য ক্ষমতার তুঙ্গে থাকা অবস্থায়ও এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না।

অবশ্য এর সাথে আরও কিছু বিষয় যুক্ত হয়েছিল যা বিজয়ে নয়, বরং রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে মুসলমানদের পুণ্য ও সততা ছিল। যে দেশ বিজিত হত সেখানকার লোকেরা মুসলমানদের পুণ্য ও সততার এতটা আসক্ত হয়ে যেত যে, ধর্মীয় মতবিরোধ সত্ত্বেও তাদের রাষ্ট্রক্ষমতার পতন চাইত না। ইয়ারমুকের যুদ্ধের পূর্বে লড়াইয়ের জন্য যখন মুসলমানরা সিরিয়ার বিভিন্ন জেলা থেকে বের হল তখন সমস্ত খ্রিষ্টান প্রজারা চিৎকার করে বলে, খোদা তোমাদেরকে পুনরায় এ দেশে ফিরিয়ে আনুন এবং ইহুদিরা তওরাত হাতে নিয়ে বলেছিল, আমাদের জীবিত থাকা অবস্থায় রোমানরা এখানে প্রবেশ করতে পারবে না। সিরিয়া এবং মিশরে রোমানদের যে শাসন ছিল তা ছিল স্বৈরাচারিতামূলক। তাই রোমানরা যে যুদ্ধ করেছে তা রাষ্ট্রক্ষমতা ও সেনাবাহিনীর শক্তিতে করেছে, প্রজারা তাদের সাথে ছিল না। মুসলমানরা যখন রাজত্বের শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এরপর দিগন্ত ছিল পরিষ্কার, কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। অর্থাৎ প্রজাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার প্রতিরোধ ছিল না। যদিও ইরানের অবস্থা এ থেকে ভিন্ন ছিল, সেখানে রাষ্ট্রের অধীনে অনেক বড় বড় রইসরা ছিল যারা বড় বড় জেলা ও প্রদেশের মালিক ছিল। তারা রাজত্বের জন্য নয় বরং নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার জন্য লড়াই করত। এ কারণেই রাজধানী বিজয় করার পরও পারস্যে মুসলমানদের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সাধারণ প্রজারা সেখানেও মুসলমানদের প্রতি দুর্বল হ য়ে যেত আর এ কারণে বিজয়ের পর রাষ্ট্রক্ষমতার স্থায়িত্বে তাদের অনেক সাহায্য লাভ হত। রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সুবিধা হত। আরেকটি বড় কারণ ছিল যে, মুসলমানদের প্রথমদিকের আক্রমণ সিরিয়া এবং ইরাকে হয়েছে আর উভয় স্থানে ব্যাপকভাবে আরব বসবাস করত। সিরিয়াতে দামেস্কের শাসক গাসসানি বংশের ছিল, যে শুধু নামেমাত্র কায়সার কর্তৃক শাসিত ছিল। ইরাকে লাখনি বংশ দেশের মালিক ছিল। যদিও কিসরাকে টেক্স হিসেবে কিছু দিত। এই আরবরা খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ার কারণে প্রথমদিকে মুসলমানদের সাথে লড়াই করেছে কিন্তু জাতিগত একতার প্রেরণা বৃথা যেতে পারে না। ইরাকের বড় বড় নেতা অনেক দ্রুত মুসলমান হয়ে গেছে এবং মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর তারা মুসলমানদের সাহায্যকারী হাতে পরিণত হয়ে গেল। সিরিয়াতে অবশেষে আরবরা ইসলাম গ্রহণ করল এবং রোমানদের রাজত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

আলেকজাণ্ডার এবং চেঙ্গীস প্রমুখদের নাম নেওয়া এখানে একেবারে অযৌক্তিক। নিঃসন্দেহে এই দুইজন অনেক বড় বড় বিজয় লাভ করেছে কিন্তু কীভাবে? কঠোরতা, অত্যাচার ও গণহত্যার মাধ্যমে। চেঙ্গীসের অবস্থা তো সবাই জানে। আলেকজাণ্ডার প্রমুখদের বিজয়ের সাথে যদি তুলনা করা হয় তাহলে আলেকজাণ্ডারের অবস্থা হলো, যখন সে সিরিয়ার সুর শহর জয় করল সে সেখানকার লোকদের গণহত্যার আদেশ দিয়েছিল কেননা সেখানকার লোকেরা দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেছে। এক হাজার নাগরিকের মাথা শহররক্ষা প্রচীরে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছিল। এর পাশাপাশি ৩০ হাজার বাসিন্দাকে দাস দাসি বানিয়ে বিক্রয় করে দিয়েছে। যারা আদিবাসী এবং স্বাধীনচেতা ছিল তাদের একজনকেও জীবিত ছাড়ে নি।একইভাবে যখন পারস্যের প্রাচীন শহর ইস্তাখার জয় করে তখন সব পুরুষকে হত্যা করে। এমনই আরো অনেক নিষ্ঠুরকর্মকাণ্ড আলেকজাণ্ডারের বিজয়গাঁথায় উল্লিখিত আছে। তাই ইসলামী বিজয়ের সাথে এসবের তুলনা করা কীভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে? এটি সর্বজনবিদিত কথা যে, অত্যাচার ও নিপীড়নে রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। এটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক যে, অন্যায়েরস্থায়িত্ব নেই। যেমন আলেকজাণ্ডারের ও চেঙ্গিসের রাজত্বও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু তাৎক্ষণিক বিজয়ের জন্য এ ধরনের রক্তপাত ও পৈষাচিকতা কার্যকরী সাব্যস্ত হয়েছে। এর ফলে দেশের পর দেশ ত্রস্ত হয়ে পড়ে আর নাগরিকদের অধিকাংশই যেহেতু মারা যায়তাই বিদ্রোহ এবং বিশৃঙ্খলার কোন আশঙ্কা থাকে না। একারণেই চেঙ্গিস, নবুকদ নযর, তৈমুর, নাদের শাহদের মত যত বড় বড়বিজয়ী গত হয়েছে তাদের সবাই নৃশংস ছিল কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর বিজয়গুলোর মাঝে কখনো নীতি ও ন্যায়নিষ্ঠাকে বিসর্জন দেওয়া হতো না।

মানুষ হত্যা করা তো দূরের কথা বৃক্ষ কাটারও অনুমতি ছিল না। শিশুকিশোর ও বৃদ্ধদের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা হতো না। যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ নিহত হয়ে গেলে সেকথা ভিন্ন। অর্থাৎ যুদ্ধ চলাকালে এদের কেউ যদি নিহত হয়ে যায় তাহলে হতে পারে কিন্তু এছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হতো না। শত্রুদের সাথে কোন ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গ বা প্রতারণা করা যেত না। কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হতো যে, শত্রু যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদের সাথে প্রতারণা করবে না, কারো নাক-কান কাটবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না- এ শর্ত মেনে প্রকাশ্যে যুদ্ধ কর। যারা অনুগত হয়ে আবার বিদ্রোহী হয়ে যেত অর্থাৎ একবার আনুগত্য করে আবার বিদ্রোহী হয়ে যায় তাদের কাছ থেকে পুনরায় চুক্তির নবায়ন করে ক্ষমা করে দেওয়া হতো। এমনকি আরাবাসুসবাসীরা যখন পরপর তিনবার চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে তাদেরকে কেবল সেখান থেকে দেশান্তরিত করে দিয়েছেকিন্তু একই সাথে অধিকৃত পুরো সম্পত্তির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। টাকা তাদেরকে দিয়ে দিয়েছে। আরবাবুস সিরিয়ার শেষ সীমান্তে অবস্থিত একটি শহরের নাম, এর সীমান্ত এশিয়া মাইনরের সাথে সংযুক্ত ছিল। এরপর লিখেন, খয়বারের ইহুদীদেরকে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের কারণে যদি দেশান্তরিত করা হয়ে থাকে তাহলে তাদের কাছ থেকে অধিকৃত সম্পত্তির মূল্য আদায় করা হয়েছিল সেই সাথে জেলাগুলোতে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে যে, এরা যে পথে যাবে তাদেরকে যেন পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করা হয় এবং তারা কোন শহরে অবস্থান করলে এক বছর পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোনরূপ কর আদায় করা হবে না।

এরপর লিখেন, যারা উমর (রা.)-এর যুগের বিস্ময়কর বিজয়গাঁথার অপনোদনে বলে যে, পৃথিবীতে এমন আরো অনেক বিজয়ী গত হয়েছে। তাদেরকে এটি দেখানো উচিত যে, এত সাবধানতা, এমন নিয়মনীতি মেনে এবং এমন ক্ষমা-মার্জনার মাধ্যমে পৃথিবীতে কোন্ শাসক এক ইঞ্চি ভূখণ্ডও জয় করেছে।? এছাড়া আলেকজাণ্ডার ও চেঙ্গিস প্রমুখ নিজেরা প্রতিটি উপলক্ষে এবং প্রতিটি যুদ্ধে যোগদান করতো এবং নিজেরা সেনাপতি হয়ে সৈন্যদেরকে যুদ্ধ করাতো আর এর ফলে একদিকে যেমন তারা এক সুদক্ষ সেনাপতি পেতো, মনোবলও দৃঢ় থাকতো আর স্বাভাবিকভাবেই তাদের মাঝে মনিবের জন্য আত্মবিলীন করে দেয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হতো। হযরত উমর (রা.) তার পুরো খেলাফতকালে একটি যুদ্ধেও যোগদান করেন নি। তার সৈন্যরা সব জায়গায় কাজ করছিল। অবশ্যতাদের লাগাম হযরত উমর (রা.)-এর হাতেই থাকতো। আরেকটি বড় ও সুস্পষ্ট পার্থক্য হলো, আলেকজাণ্ডার প্রমুখের বিজয়সমূহ প্রবহমান মেঘের ন্যায় ছিল।

একবার প্রবল বেগে এসে আবার চলে গেছে। তারা যে সমস্ত দেশ জয় করেছে সেগুলোতে কোন প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে নি। এর বিপরীতে হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর বিজয়সমূহের দৃঢ়দিক হলো, যেসব দেশ সেসময় বিজিত হয়েছে তেরশ' বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আজও মুসলমানদের অধীনে রয়েছে এবং স্বয়ং হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালেই সেসব দেশে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

এরপর বিজয়সমূহে হযরত উমর (রা.)-এর বিশেষ অবদান প্রসঙ্গে লিখেন, সাধারণের মতানুসারে শেষ প্রশ্নের উত্তর হলো, এসব বিজয়ে যুগ-খলীফার তেমন কোন অবদান নেই বরং তখন বিরাজমান উচ্ছাস-উদ্দীপনা ও দৃঢ়-সংকল্পের ফলে এসব বিজয় লাভ হয়েছে। এটি একটি প্রশ্ন। কিন্তু তিনি বলেন, খলিফার সক্রিয় ভূমিকা নেই- কথাটি আমার মতে সঠিক নয়। হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)'র যুগেও তো একই মুসলমান ছিলেন কিন্তু ফলাফল কী হয়েছে? তাঁদের উদ্দীপনা, প্রভাব, নিঃসন্দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি কিন্তু এসব শক্তি তখনই কার্যকর সাব্যস্ত হয় যখন কার্যনির্বাহকও সেই একই বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতার অধিকারী হয়। কোন ধরণের অনুমান ও যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন নেই; বাস্তব ঘটনাই এর সিদ্ধান্ত দিতে পারে। বিজয়াভিযানগুলোর বিস্তারিত বৃত্তান্ত পড়ে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, গোটা সেনাবাহিনী ক্রীড়নকের ন্যায় হযরত উমর (রা.)'র দিক-নির্দেশনায় চলতো আর সেনাবাহিনীর নিয়ম-শৃঙ্খলাও ছিল তাঁর বিশেষ (রা.) বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতি ও পরিকল্পনার ফল। হযরত উমর (রা.) সেনাবাহিনীর কাঠামো বিন্যাস, সৈন্যদের প্রশিক্ষণ, সেনানিবাস বা ব্যারাকসমূহের নির্মাণ, যুদ্ধে ব্যবহৃত ঘোড়ার প্রশিক্ষণ, দুর্গের নিরাপত্তা, শীত ও গ্রীষ্মের নিরীখে আক্রমণের সিদ্ধান্ত প্রদান, সেনাদের নিযুক্তি ও রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা, সেনাকর্মকর্তা মনোনয়ন, দুর্গ ভাঙ্গার অস্ত্রাদি ব্যবহার এসব জিনিস এবং এধরনের আরো বিষয়াদি নিজেই উদ্ভাবন করেন আর এগুলোকে কী বিস্ময়কর দৃঢ়তার সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছেন! এই হলো হযরত উমর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য। ইরাক বিজয়ের সময় প্রকৃতপক্ষে হযরত উমর (রা.) স্বয়ং সেনাপ্রধানের ভূমিকা পালন করেছেন। সেনাবাহিনী যখন মদীনা থেকে রওনা হয় তখন প্রতিটি মঞ্জিল বরং রাস্তা পর্যন্ত নিজেসুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, এখান থেকে যাবে আর এই পথ ব্যবহার করবে; এখানে এই কাজ করবে এবং তদনুযায়ী তিনি (রা.) নিয়মিত লিখিত দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করতেন। সেনাবাহিনী যখন কাদসীয়া'র কাছাকাছি পৌঁছে তখন তিনি (রা.) রণক্ষেত্রের মানচিত্র চেয়ে পাঠান এবং তদানুযায়ী সেনাবাহিনীর বিন্যাস ও সারির শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করতেন। সেনা কর্মকতারা যে যে কাজে নিযুক্ত হতেন তারা মূলত তাঁরই বিশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী সেই দায়িত্বে নিযুক্ত হতেন। তাবারীর ইতিহাসে ইরাক যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, দূর থেকে এক মহান সেনানায়ক গোটা সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করছেন এবং আর সব-ই তাঁর ইশারায়ই ঘটছে। দশ বছরে সংঘটিত এ সব যুদ্ধাভিযানে দু'টি রণক্ষেত্র ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ; প্রথমতঃ নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ যখন ইরানীরা পারস্যের প্রতিটি প্রদেশে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ পাঠিয়ে গোটা দেশে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ সৈন্য জড় করে মুসলিম শিবির অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিল। আর দ্বিতীয়তঃ যখন রোমান বাদশাহ জাযিরা'র অধিবাসীদের সহযোগিতায় দ্বিতীয় বার হিমসের ওপর আক্রমণ করেছিল। এ দু'টি যুদ্ধেই কেবল হযরত উমর (রা.)'র বিচক্ষণ ও সুচৌকস রণকৌশলই ছিল যা একদিকে সৃষ্ট তুফানকে স্তিমিত করে দেয় আর অন্যদিকে একটি দুর্গম পর্বতকে ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে। এসব ঘটনার বিবরণ থেকে এই দাবি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর জানা ইতিহাসে, হযরত উমর ফারুক (রা.)'র মত আজ পর্যন্ত কোন এমন বিজয়ীও দেশ করতলগতকারী জন্মে নি যে যুগপৎ বিজয় এবং ন্যায়পরায়ণতার সমাহার হবে। অর্থাৎ বিজয়ও অর্জন করেছে পাশাপাশি ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সুবিচারও করেছে।

(আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলী নুমানী, পৃ: ১৭০-১৭৭, ২৮৭) (দায়েরায়ে মারেফে ইসলামিয়া, খণ্ড-২০, পৃ: ৫২৯-৫৩০) (উর্দু লুগাত, খণ্ড-১৯, পৃ: ৯৩২) (উর্দু লুগাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৮১-২৮২) (মুজামুল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪৯-২৫০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর দোয়া দেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর থেকে বর্ণিত, একবার মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে শুভ্র পোষাক পরিহিত দেখতে পান। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমার এই পোষাকটি কি নতুন নাকি ধোয়া পোষাক? হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমার ঠিক মনে নেই, হযরত উমর (রা.) এর কী জবাব দিয়েছেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁকে দোয়া দিতে গিয়ে বলেন, নতুন পোষাক পরিধান কর এবং প্রশংসনীয় জীবনযাপন কর; শহীদের মৃত্যু লাভ কর। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, মহানবী (সা.) এ কথাও বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে ইহ ও পরকালে চোখের স্নিগ্ধতা দান করুন।

(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৯)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) কে সাথে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে উঠেন তখন তাদের নিয়ে উহুদ পাহাড় কাঁপতে থাকে। তিনি (সা.) বলেন, হে উহুদ! থেমে যাও, তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং একজন দুইজন শহীদ রয়েছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলু আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৭৫)

হযরত উবাই বিন কা'ব বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, জিবরাঈল আমাকে বলেছেন, হযরত উমরের মৃত্যুতে গোটা ইসলামী বিশ্ব কাঁদবে।

(মুজামুল কাবীর লিততিবরানী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৭-৬৮)

হযরত উমরের শাহাদতের আকাঙ্খা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) এর পবিত্র সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি আমার বাবা-কে একথা বলতে শুনেছি যে, اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ قَتْلًا فِيْ سَبِيْلِكَ وَوَفَاةً فِيْ بَلَدِ نَبِيِّكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদতের সৌভাগ্য দাও এবং আমাকে তোমার নবী (সা.)-এর শহরে মৃত্যু দাও। তিনি বলেন যে, আমি বললাম এটি কিভাবে সম্ভব? তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, إِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيْ بِأَمْرِهٖ أَنّٰى شَاءَ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ যেভাবে চান তার আদেশ কার্যকর করেন।

(আততাবাকুতল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫২)

হযরত উমর (রা.) শাহাদত সম্পর্কে যে দোয়া করেছিলেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার কত নৈকট্যভাজন ছিলেন! মহানবী (সা.) বলেন, আমার পর যদি কেউ নবী হত, তাহলে উমর হত। এখানে আমার পর কথার মর্মার্থ হল অব্যবহিত পর। অতএব সেই ব্যক্তি যাকে মহানবী (সা.)ও এই সম্মানের যোগ্য মনে করতেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'লার এই যুগের প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে শাহাদতের মর্যাদা থেকে উন্নীত করে নবুওয়তের উচ্চ মর্যাদায় আসীন করার থাকতো তাহলে হযরত উমর (রা.) এর যোগ্য ছিলেন। সেই উমর (রা.), যার আত্মত্যাগ দেখে ইউরোপের কঠোর বিরোধীও স্বীকার করে যে, এই ধরনের ত্যাগ স্বীকারকারী এবং এভাবে আত্মপেষণকারী মানুষ খুব কমই পাওয়া যায়। এমনকি তারা তার অবদানের বিষয়ে এতটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়ে ইসলামের উন্নতি কেবল তার সাথেই সম্পৃক্ত করে বসে। সেই উমর (রা.) দোয়া করতেন যে, হে খোদা! আমার মৃত্যু যেন মদিনায় হয় এবং যেন শাহাদতের মৃত্যু হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লিখেন, হযরত উমর (রা.) এই দোয়া ভালবাসার আতিশয্যে করেছেন অন্যথায় এই দোয়া অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। এর অর্থ দাড়ায়, কোন এমন ভয়াবহ আক্রমণকারী সৃষ্টি কর যে সমস্ত ইসলামী দেশসমূহ বিজয় করে মদিনায় আসবে এরপর সেখানে তাকে (রা.) শহীদ করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যিনি হৃদয়ের অবস্থা জানেন তিনি হযরত উমর (রা.)-এর এই ইচ্ছাও পূরণ করেছেন এবং মদিনাকেও সেই বিপদ থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন যা মূলত এই দোয়ার অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। আর এটি এভাবে হয়েছে যে, তিনি মদিনাতেই এক কাফিরের হাতে তাকে (রা.) শহীদ করিয়েছেন। যাহোক, হযরত উমরের দোয়া থেকে জানা যায় যে, তার (রা.) নিকট খোদা তা'লার নৈকট্যের লক্ষণ হলো, নিজের প্রাণ তার রাস্তায় উৎসর্গের সুযোগ লাভ করা। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তার এক খুতবায় আহমদীদের নসীহত করতে গিয়ে বলেন,আজ খোদার কোন বান্দার প্রাণ রক্ষা করাকেই খোদার নৈকট্যের লক্ষণ বলে মনে করা হয় ।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৭, পৃ: ৪৭৪-৪৭৫)

অন্য একস্থানে হযরত উমর (রা.) এর শাহাদতের ঘটনা এবং দোয়ার

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে উল্লিখিত আছে যে, তিনি (রা.) সর্বদা দোয়া করতেন তার মৃত্যু যেন মদিনায় হয় এবংযেন শাহাদতের মৃত্যু হয়।

দেখ, মৃত্যু কত ভয়ংকর বিষয়! মৃত্যুর সময় একান্ত আপনজনরাও সঙ্গ ছেড়ে দেয়। মানুষ মৃত্যুকে কতটা ভয় পায় এ সম্পর্কে মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি গল্প শুনিয়ে বলছেন। ভয়ের এই ঘটনাটি হলো, একবার জনৈক মহিলার মেয়ে অসুস্থ হয়ে যায় সে দোয়া করত, হে আমার আল্লাহ্! আমার মেয়ে যেন প্রাণে বেঁচে যায় আর তার স্থলে আমি মরে যাই। মেয়ের প্রতি সে গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করছিল। কাকতালীয়ভাবে এক রাতে সেই মহিলার গাভীর (গলা থেকে) রশি খুলে যায় আর সেই গাভী কোন পাত্রে মুখ ঢুকিয়ে দেয়। ফলে এতে তার মাথা আটকে যায় আর মটকা মাথায় লাগানো অবস্থায়ই সেটি এদিক সেদিক দৌড়াতে থাকে। গাভী অস্থির হয়ে যায়, কেননা মাথা আটকে গেছে, দৌড়াতে থাকে। গাভীর শরীরে মাথার পরিবর্তে অন্য কোন বড় জিনিস– এটি দেখে সেই মহিলা ভয় পেয়ে যায়। ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর সে দেখে, এটি কী! গাভী দৌড়াচ্ছে আর এর মাথার পরিবর্তে অন্য কিছু দেখা যাচ্ছে। ফলে সে ভয় পেয়ে যায়। সে মনে করে, হয়তো আমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে আর আজরাঈল আমার জান কবয করতে এসেছে। তাই সে অবলীলায় বলে উঠে, হে আজরাঈল! অসুস্থ আমি নই বরং সে শুয়ে আছে, তার জান কবয কর। অর্থাৎ মেয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জীবন এত প্রিয় জিনিস যে, একে বাঁচানোর জন্য মানুষ যথাসম্ভব চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে। প্রথমে তো সে দোয়া করছিল কিন্তু যখন দেখল, আসলেই তেমন আশঙ্কার সৃষ্টি হয়ে গেল তখন মেয়ের দিকে ইশারা করে বলে দিল, তার জান কবয কর। তিনি (রা.) বলেন, জান বাঁচানোর জন্য মানুষ সব ধরণের চেষ্টা তদবির করে, চিকিৎসা করতে করতে নিঃস্ব হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রিয় প্রাণই খোদার তরে উৎসর্গ করতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এত বেশি আকাঙ্খী ছিলেন যে, হযরত উমর (রা.) দোয়া করতেন– আমি যেন মদিনায় শাহাদত বরণ করতে পারি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি ভাবি– হযরত উমর (রা.)-এর এ দোয়া কেমন ভয়ঙ্কর ছিল! এর অর্থ হলো– শত্রুরা মদিনায় চড়াও হোক আর মদিনার পথে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করুক। কিন্তু খোদা তা'লা তার দোয়াকে অন্যভাবে কবুল করেন আর মুসলমান আখ্যায়িত এক ব্যক্তির হাতে মদিনায় শহীদ হন। বলা হয়ে থাকে, যে শহীদ করে সে কাফের ছিল, কিন্তু কোন কোন স্থানে এ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান যে, সম্ভবত মুসলমান আখ্যায়িত হত। যাহোক, সাধারণ ধারণা হলো সে কাফের ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) প্রথমে তাকে কাফের হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং অন্য স্থানে বলেন যে, সে মুসলমান আখ্যায়িত হতো। তিনি (রা.) নিজেও পুরোপুরি আশ্বস্ত নন যে, সে মুসলমান ছিল কিনা? হুঁ্যা! তিনি (রা.) নিজেই লিখছেন, অনেকের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি মুসলমান ছিল না। মোটের ওপর সে একজন দাস ছিল, যার মাধ্যমে খোদা তা'লা হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করিয়ে দিয়েছেন। অতএব মানুষ নিজে যেসব জিনিসের আকাঙ্খা করে এবং প্রত্যাশা করে সেগুলো তার জন্য বিপদ হয় না।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খণ্ড , পৃ: ১৬৬-১৬৭)

এ ঘটনাও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি খুতবাতে বর্ণনা করেছিলেন।

হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদত ও মৃত্যু সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর স্বপ্ন: হযরত আবু বুরদা (রা.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, হযরত অওফ বিন মালিক (রা.) এক স্ব প্ন দেখেন, একটি মাঠে লোকদের একত্র করা হয়েছে। তাদের মাঝে এক ব্যক্তি তাদের চেয়ে তিন হাত উঁচু। আমি জিজ্ঞেস করি, ইনি কে? বলা হয়, ইনি উমর বিন খাত্তাব। আমি জিজ্ঞেস করি, তিনি অন্য লোকদের তুলনায় এত উঁচু কেন? (উত্তরে বলা হয়) তার মাঝে (বিশেষ) তিনটি গুণ রয়েছে, (১) আল্লাহ্র বিষয়ে তিনি কোন তিরষ্কারকারী তিরষ্কারকে ভয় করেন না, (২) তিনি আল্লাহ্র পথে শাহাদ তবরণকারীর এবং (৩) যাদেরকে খলীফা বানানো হবে তিনি তাদের একজন। এরপর হযরত অওফ (রা.) তার স্বপ্ন শোনানোর জন্য হযরত আবু বকর (রা.) -এর নিকট আসেন এবং তাকে এসব কথা বলেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা ছিলেন। এটি বলার পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং তাকে সুসংবাদ দেন আর হযরত অওফ (রা.)-কে বলেন, তোমার স্বপ্ন শুনাও। রেওয়ায়েতকারী বলেন, তিনি যখন বলেন, তাকে খলীফা বানানো হবে তখন হযরত উমর (রা.) তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেন। কেননা এটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনের ঘটনা। এরপর হযরত উমর (রা.) যখন খলীফা মনোনীত হন তখন তিনি সিরিয়া যান।তিনি (রা.) বক্তৃতা করছিলেন, এমন সময় হযরত অওফ (রা.) -কে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে ডেকে মিম্বরে দঁ াড় করিয়ে স্বপ্ন শুনাতে বলেন। তিনি তার স্ব প্নের কথা শোনালেন। শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন, এ বিষয়ের যতটুকু সম্পর্ক যে আমি আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনাকে ভয় পাই না, আমি আশা রাখি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আমাকে খলীফা বানানো হবে মর্মে যে কথা রয়েছে সে অনুসারে আমি খলীফা নির্বাচিত হয়েছি এবং আমি আল্লাহ্র নিকট এই দোয়া করি, তিনি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেকাজে আমাকে যেন সাহায্য করেন। আর আমাকে শহীদ করা হবে– এ বিষয়টি সম্পর্কে কথা হলো, আমার শাহাদত বরণ করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে! কেননা আমি আরব ভূখণ্ডে বাস করি এবং আশপাশের লোকদের সাথে যুদ্ধ করি না। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যদি চান তবে শাহাদতের ঘটনা ঘটাবেন, অর্থাৎ বাহ্যত যদিও পরিস্থিতি নেই কিন্তু আল্লাহ্ চাইলে তা হতে পারে।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি অনেক পথ অবলম্বন করেছি কিন্তু সবগুলোই নিশ্চিন্ন [বানানটি ঠিক করতে হবে, আমার কম্পিউটারে হচ্ছে না] হয়ে গেছে কেবল একটি ছাড়া। আমি সেটি ধরে চলা শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমি একটি পাহাড়ে পৌঁছলাম। তাতে মহানবী (সা.)-কে দেখতে পাই। তাঁর (সা.) পাশে হযরত আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে আছেন এবং তিনি হযরত উমর (রা.)-কে ইঙ্গিতে আসার জন্য ডাকছেন। আমি বললাম, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । আল্লাহ্র কসম! আমীরুল মু'মিনীন ইন্তেকাল করেছেন। তিনি মনে মনে এমনটি বলছিলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি বললাম, আপনি এই স্বপ্নের কথা হযরত উমর (রা.)-কে লিখবেন না। তিনি বলেন, আমি এমন নই যে, হযরত উমর (রা.)-কে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিব।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫২-২৫৩)

হযরত সাঈদ বিন আবু হেলাল (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত উমর (রা.) জুমুআর দিন লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করছিলেন। তিনি (রা.) আল্লাহ্ তা'লার যথাযথ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। অতঃপর বলেন, হে লোকসকল! আমাকে একটি স্বপ্ন দেখানো হয়েছে যা থেকে আমি মনে করি, আমার মৃত্যু সন্নিকটে। আমি দেখি, একটি লাল মোরগ যেটি দুইবার আমাকে ঠোকর মেরেছে। আমি এই স্বপ্নটি হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি বলেন, অর্থাৎ এর ব্যাখ্যা করেন যে, অনারব কোন ব্যক্তি আমাকে হত্যা করবে।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৫)

হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনা সম্পর্কে লেখেন, হযরত উমর (রা.)-এর ওপর কোন্ দিন আক্রমণ হয় এবং কবে তার দাফন হয়– এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়।

তাবাকাতুল কুবরাতে লেখা আছে, হযরত উমর (রা.)-এর উপর বুধবার হামলা করা হয় এবং বৃহস্পতিবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হযরত উমর (রা.)-কে ২৩ হিজরীর ২৬ যুল হাজ্জ হামলা করে আহত করা হয় এবং ২৪ হিজরী ১ মহররম ভোরে তাঁর দাফনকার্য সম্পাদিত হয়। উসমান আখনাস বলেন, তাঁর (রা.) মৃত্যু ২৬ যুল হাজ্জ রোজ বুধবারে হয়। আবু মা'শার বলেন, হযরত উমর (রা.)-কে ২৭ যুল হাজ্জ শহীদ করা হয়েছে।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫২-২৫৩) (আল বাদাইয়াতু ওয়ান নিহাইয়াতু লি ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৪)

তাবরী এবং ইবনে কাসীর-এর ইতিহাস ছাড়াও অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে হযরত উমর (রা.) ২৬ যুল হাজ্জ ২৩ হিজরীতে আহত হন এবং ১ মহররম ২৪ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আর সেদিনই তাঁর কাফন-দাফন সম্পন্ন হয়।

(তারিখে তাবারী, ৫ম ভাগ, পৃ: ৫৪) (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৮) (আল ফারুক, প্রণেতা শিবলী নোমানী, পৃ: ১৫৪)

শাহাদতের ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে সহীহ্ বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আমর বিন মাইমুন (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর (রা.)-কে তাঁর আহত হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে মদীনায় দেখি যে, তিনি হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান এবং হযরত উসমান বিন হোনাইফ যাদের ওপর খিলাফতের পক্ষ থেকে ইরাকের ভূমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলতাদের কাছে দাড়ান এবং বলেন, তোমরা উভয়ে কী কী করেছো? কোথায়ও এমনটি নয়তো যে, তোমরা দু'জন জমির উপর এমন কর নির্ধারণ করেছ যা আদায়ের সামর্থ তাদের নেই? তারা দু'জন বললেন, আমরা ততটুকু কর নির্ধারণ করেছি যা আদায়ের সামর্থ তারা রাখে। অর্থাৎ জমি সে পরিমাণ ফসল উৎপাদনে সক্ষম। এক্ষেত্রে কোন অন্যায় করা হয় নি।

হযরত উমর (রা.) বলেন, পুনরায় যাচাই করে দেখ যে, কোথাও তোমরা ভূমির ওপর এমন কর ধার্য কর নি তো যা তারা পরিশোধ করতে অপারগ?বর্ণনাকারী বলেন, তারা উভয়েই জবাবে বলে, না। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ যদি আমাকে সুস্থ-সবল রাখেন তবে অবশ্যই আমি ইরাকের বিধবাদের এমন অবস্থায় রেখে যাব যে আমার পরে তারা আর কোন ব্যক্তির প্রতি মুখাপেক্ষি হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এই কথোপকথনের পর হযরত উমর (রা.)-এর জীবনে চতুর্থ রাত আসার পূর্বেই তিনি আহত হন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যেদিন আহত হন সেদিন আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং আমর ও তাঁর মাঝে কেবল হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) ছিলেন। আর দুই সারির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় 'সারিগুে লা সোজা করে নাও'- বলতে থাকা তাঁর অভ্যাস ছিল। যখন সারির মাঝে কোন খালি স্থান থাকত না তখন তিনি সামনে গিয়ে আল্লাহু আকবার বলতেন। প্রায় সময় ফজরের নামাযে তিনি সূরা ইউসু ফ বা সূরা নাহাল অথবা এ ধরণের কোন সুরা প্রথম রাকা'তে পাঠ করতেন যাতে লোকেরা একত্রিত হতে পারে। তিনি (রা.) সবেমাত্রআল্লাহু আকবার বলেছিলেন, এমন সময় আমি তাঁকে বলতে শুনি, আমাকে মেরে ফেলেছে অথবা বলেছেন, কুকুর আমাকে কামড় দিয়েছে। সে, অর্থাৎ সেই অনারব আততায়ী তাঁর ওপর আক্রমণ করার পর দোধারী ছুরি নিয়ে পালাতে থাকে। সে ডানে বামে যাকেই পাচ্ছিল তাকে আহত করছিল, অর্থাৎ সে যেদিক দিয়েই যাচ্ছিল ভয়ে কিংবা কেউ যদি ধরার চেষ্টা করলে সেই ছুরি দিয়েই তার ওপরও আক্রমণ করছিল এবং লোকদেরকে আহত করছিল। এভাবে সে ১৩ জনকে আহত করে আর তাদের মধ্য থেকে ৭জন মৃত্যুবরণ করে।

মুসলমানদের এক ব্যক্তি যখন এ অবস্থা দেখল তখন সে তার কোট কোটটি আততায়ীর ওপর ছুড়ে মারে।বুখারীতে এর জন্য বুর্নুস শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এটি এমন কাপড় যাতে মাথা ঢাকার অংশও থাকে। এক ধরণের লম্বা জুব্বা যার সাথে মাথা ঢাকার জন্য টুপিসদৃ শ অংশ যুক্ত থাকে। লম্বা টুপিকেও (বুর্নুস) বলা হয়। সে যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সে ধরা পড়ে গেছে তখন সে তার নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে দেয়। অপরদিকে হযরত উমর (রা.) আব্দুর রহম ান বিন অওফ (রা.)-এর হাত ধরে সামনে নিয়ে আসেন আর বর্ণনাকারী বলেন, যারাই হযরত উমর (রা.)-এর কাছে ছিলেন তারাও তা দেখেছে যা আমি দেখেছিলাম। কিন্তু যারা মসজিদের প্রান্তভাগে ছিল তারা হযরত উমর (রা.)-এর (এ অবস্থা সম্পর্কে) জানত না, তারা শুধু হযরত উমর (রা.)-এর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল না, তাই তারা সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্ বলছিল। এ অবস্থায় হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) লোকদের সংক্ষিপ্ত নামায পড়ান। নামায শেষ করার পর হযরত উমর (রা.) বলেন, ইবনে আব্বাস দেখ! কে আমাকে আঘাত করেছে? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে খোঁ াজখবর নিয়ে ফিরে এসে বলেন, মুগিরার দাস । হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি কি সেই কারিগর? উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করুন, অথচ আমি তার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছিলাম।

আমি আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ, কেননা আল্লাহ্ আমার মৃত্যু এমন ব্যক্তির হাতে ঘটান নি যে মুসলমান হওয়ার দাবি করে। অর্থাৎ এখান থেকেও প্রমাণিত হলো, সে মুসলমান ছিল না। হে ইবনে আব্বাস! তুমি ও তোমার পিতা মদিনায় বেশি বেশি অনারব দাস থাকা পছন্দ করতে। হযরত আব্বাস (রা.)-এর নিকট সবচেয়ে বেশি কৃতদাস ছিল। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আপনি অনুমতি দিলে আমি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাই। অর্থাৎ আপনি চাইলে আমরাও মদিনায় বসবাসকারী অনারব দাসদের হত্যা করতে চাই। তিনি বলেন, এমনটি করা ঠিক হবে না। হযরত উমর (রা.) বলেন, এমন করা ঠিক নয়। তিনি (রা.) বলেন, বিশেষ করে এখন তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে এবং তোমাদের ক্বিবলামুখী হয়ে নামায পড়ে আর তোমাদেরই মত হজ্জব্রত পালন করে। অনেক দাস এমনও ছিল যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এরপর আমরা তাঁকে, অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-কে সেখান থেকে উঠিয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে যাই। আমরাও তাঁর সাথে ঘরে চলে যাই। মনে হচ্ছিল যেন ইতোপূর্বে আর কখনো মুসলমানদের ওপর এমন কোন বিপদ আপতিত হয় নি। কেউ বলছিল, কিছুই হবে না আবার কেউ বলছিল, তাঁর বিষয়ে আমি শঙ্কিত যে, তিনি বাঁচবেন না।অবশেষে তাঁর কাছে 'নাবিয' আনা হয় এবং তিনি তা পান করেন, যা তাঁর পেট দিয়ে বেরিয়ে যায়। অতঃপর তাঁর কাছে দুধ আনা হয়। তিনি তা পান করেন। তা-ও তাঁর ক্ষতস্থান দিয়ে বেরিয়ে গেলে মানুষ নিশ্চিৎ হয়ে যায় যে, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। আমর বিন মায়মুন বলেন, এরপর আমরা তাঁর কাছে যাই এবং অন্যরাও আসে, যারা তাঁর প্রশংসা করা আরম্ভ করে। এরপর এক যুবক আসে। সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আল্লাহ্ তা'লার এই সুসংবাদে আনন্দিত হোন যা আপনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী হওয়ার কারণে এবং প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণের সম্মানের কারণে লাভ করেছেন, যা আপনি খুব ভালো করেই জানেন। এরপর আপনি খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন আর আপনি ন্যায়বিচার করেছেন। এরপর রয়েছে শাহাদতের(মর্যাদা)। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার বাসনা হলো এই কথাগুলো সমান সমানই থাক। আমার যেন হিসাব নেয়া না হয় আর আমি প্রতিদানও চাই না। যখন সেই যুবক ফিরে যাচ্ছিল তখন তার লুঙ্গি ভূমি স্পর্শ করছিল। হযরত উমর বলেন, এই ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তিনি (তাকে) বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! নিজের কাপড় ওপরে উঠিয়ে রেখো, এতে তোমার কাপড়ও বেশি দিন টিকবে এবং মাটিতে হেঁচড়ানোর ফলে ফাটার যে আশংকা থাকে তাও থাকবে না। আর এই কাজটি তোমার প্রভুর কছে তাক্বওয়ার অধিক নিকটতর হবে। অর্থাৎ অহেতুক অহংকার দানা বাধতে পারে। সেযুগে মানুষ বিত্তশালীতার[এই শব্দ ব্যবহার হয় কিনা?] নিদর্শন হিসেবে লম্বা কাপড় পরিধান করতো তাই তিনি বলেন, অহংকার যেন সৃষ্টি না হয়, এটি তাকওয়ার অধিক নিকটে।

অতঃপর আব্দুল্লাহ্ বিন উমরকে তিনি বলেন, (হিসাব করে) দেখ আমার মোট ঋণ কত? তিনি হিসাব করে দেখেন যে, ৮৬ হাজার দিরহাম বা এর কাছাকাছি হবে। হযরত উমর বলেন, যদি উমরের পরিবারের সহায় - সম্পত্তি দ্বারা তা পরিশোধ হতে পারে তাহলে তাদের সম্পত্তি থেকে তা পরিশোধ করে দাও। নতুবা বনু আদি বিন কা'ব গোত্রের কাছে চাইবে। যদি তাদের সম্পত্তিও এর জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে কুরায়েশদের কাছে চাইবে, আর এছাড়া আর কারো কাছে যাবে না। আমার পক্ষ থেকে এই ঋণ পরিশোধ করে দিও। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে যাও এবং তাকে বল, উমর আপনাকে সালাম বলেছেন, আমীরুল মু'মিনীন বলো না, কেননা আজ আমি মু'মিনদের আমীর নই। তাকে বল যে, উমর বিন খাত্তাব তাঁর দুই সাথীর সাথে সমাহিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছেন।

বুখারীর ব্যাখ্যাপুস্তক 'উমদাতুল ক্বারী'-তে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর এ কথা তখন বলেছিলেন যখন মৃত্যুর বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। আর হযরত আয়েশার জন্য এতে ইঙ্গিত ছিল যেন আমী রুল মু'মিনীন বললে তিনি ভয় পেতে পারেন। অতএব আব্দুল্লাহ্ সালাম বলেন এবং ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি তার কাছে ভেতরে গেলে তাকে বসে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পান। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, উমর বিন খাত্তাব আপনাকে সালাম বলেছেন আর তার উভয় সাথীর সাথে দাফন হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। হযরত আয়েশা বলেন, আমি এই জায়গাটি আমার নিজের জন্য রেখেছিলাম, কিন্তু আজ আমি নিজ সত্তার ওপর তাকে অগ্রগণ্য করব। হযরত আব্দুল্লাহ্ যখন ফিরে আসেন তখন হযরত উমরকে বলা হয় যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর ফিরে এসেছেন। তিনি বলেন, আমাকে উঠাও। তখন এক ব্যক্তি তাকে ধরে উঠায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, কী সংবাদ নিয়ে এসেছ? আব্দুল্লাহ্ বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন তা-ই যা আপনি পছন্দ করেন, হযরত আয়েশা অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, কোন বিষয়ে এর চেয়ে বেশি চিন্তা আমার ছিল না। আমি যখন মারা যাব তখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেও। এরপর সালাম বলো এবং বলবে, উমর বিন খাত্তাব অনুমতি প্রার্থনা করছেন। তিনি যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে আমাকে কক্ষের ভেতরে দাফন করার জন্য নিয়ে যেও। আর তিনি যদি আমাকে ফিরিয়ে দেন তাহলে আমাকে মুসলমানদের কবরস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেও। (এরপর) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা আসেন। আর অন্যান্য মহিলারাও তার সাথে আসেন। তাঁদেরকে দেখে আমরা বেরিয়ে যাই। তিনি তাঁর কাছে ভেতরে যান এবং কিছুক্ষণ তাঁর কাছে বসে অশ্রুপাত করেন। এরপর কিছু পুরুষ ভেতরের অংশে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে পুরুষদের আসতেই তিনি ভেতরে চলে যান আর আমরা ভেতর থেকে তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। মানুষ বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! ওসীয়্যত করুন, কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে যান। তিনি (রা.) বলেন, আমি সেই কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে এই খিলাফতের অধিক যোগ্য মনে করি না, যাদের ওপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আর তিনি (রা.) হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত যুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত সা'দ ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর তোমাদের সাথে উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু এই বিষয়ে [অর্থাৎ খিলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার] তার কোন অধিকার থাকবে

না। যদি সা'দ খিলাফতের দায়িত্ব পান তবে তিনিই খলীফা হবেন; নতুবা তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই আমীর নির্ধারিত হবে, সে যেন সা'দের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে, কেননা আমি তাকে এজন্য অপসারণ করিনি যে, তিনি কোন কাজ করতে অপারগ ছিলেনকিংবা কোন অবিশ্বস্ততা করেছেন। তিনি আরও বলেন, আমার পরে যে খলীফা হবে, তাকে আমি প্রথম যুগের মুহাজিরদের বিষয়ে ওসীয়্যত করছি, যেন তিনি তাদের প্রাপ্য তাদেরকে প্রদান করেন, তাদের সম্মানের প্রতি যত্নবান হন। আমি আনসারদের বিষয়েও হিতসাধনের ওসীয়্যত করছি, যারা আগে থেকেই মদিনায় বসবাস করে আসছিল এবং মুহাজিরদের আসার পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছিল; তাদের মধ্য থেকে যে পুণ্যকর্মশীল, তাকে যেন মূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের মধ্য থেকে যে দোষী সাব্যস্ত হবে, তাকে যেন ক্ষমা করা হয়। আর আমি তাকে সকল শহরের অধিবাসীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার ওসীয়্যত করছি, কেননা তারা ইসলামের পৃষ্ঠপোষক ও সম্পদ লাভের উৎস এবং শত্রুদের গাত্রদাহের কারণ; আর এ-ও (ওসীয়্যত করছি) যে তাদের সম্মতিক্রমে তাদের কাছ থেকে তা-ই নেওয়া হয়, যা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে উদ্বৃত্ত থাকে। আর আমি তাকে [অর্থাৎ পরবর্তী খলীফাকে] বেদুঈন আরবদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার ওসীয়্যত করছি, কারণ তারা আরবদের আদিবাসী এবং ইসলামের মূল উৎস; তাদের সম্পদ থেকে যেন সেটি নেয়া হয় যা উদ্বৃত্ত থাকে এবং এরপর (তা) তাদের অভাবীদের জন্য ব্যয় করা হয়। আর আমি তাকে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসূল (সা.) প্রদত্ত নিরাপত্তার বিষয়ে দায়িত্বশীল হওয়ার ওসীয়্যত করছি অর্থাৎ তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ যেন পূর্ণ করা হয় ও তাদের সুরক্ষার্থে যুদ্ধ করা হয় এবং তাদের সাধ্যাতীত কোন ভার যেন তাদের ওপর অর্পণ না করা হয়। যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন তখন আমরা তাকে নিয়ে বের হই এবং পায়ে হেঁটে অগ্রসর হই। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত আয়েশাকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলার পর বলেন, উমর বিন খাত্তাব অনুমতি চাইছেন। তিনি (অর্থাৎ হযরত আয়েশা) বলেন, তাকে ভেতরে নিয়ে আস। অতঃপর তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তার দুই বন্ধুর পাশে সমাহিত করা হয়। যখন তার দাফনকার্য সমাধা হয় তখন সেই ব্যক্তিবর্গ খিলাফতের নির্বাচন করার জন্য একত্রিত হন, যাদের নাম হযরত উমর উল্লেখ করেছিলেন। আর এরপর পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পন্ন ত হয়।

(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলি আসহাব, হাদীস-৩৭০০) (উমদাতুল কারী, শারাহ বুখারী, খণ্ড-১৬, পৃ: ২৯২) (লুগাতুল হাদীস-১ম খণ্ড, পৃ: ১৩৭, প্রকাশনায়- নুমানী কুতুব খানা, লাহোর, ২০০৫)

এই বিষয়ে অবশিষ্ট বিবরণ পরবর্তীতে দেওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ্; এটি এখনও চলমান রয়েছে।আজ জার্মানীর বার্ষিক জলসাও আরম্ভ হতে যাচ্ছে; আল্লাহ্ তা'লা সেটিকে কল্যাণমণ্ডিত করুন, অধিক সংখ্যক জার্মান আহমদীকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দান করুন। এটি দুদিবসীয় জলসা; আগামীকাল বিকেলে তাদের সমাপনী অধিবেশনে আমি ভাষণও প্রদান করব, ইনশাআল্লাহ্, যা এম.টি.এ.-তে সম্প্রচার করা হবে; এখানকার সময় অনুযায়ী আনুমানিক সাড়ে তিনটায়। বাকি জলসা যা জার্মানীতে আজ থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, জার্মানদের জন্য সেটির সরাসরি স্ট্রীম করা হচ্ছে; জার্মানরা সেখানে দেখতে পারবেন। তাই এর দ্বারা বেশি বেশি উপকৃত হোন।

নামাযের পর আমি দু'ব্যক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াব, তাদেরও স্মৃতিচারণ করছি। প্রথম জানাযা হলো ইন্দোনেশিয়া জামা'তের মু বাল্লেগ কমরুদ্দীন সাহেবের, যিনি সম্প্রতি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । ১৯৭২ সালে তিনি পনের বছর বয়সে বয়আত গ্রহণ করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার পর জামা'তের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। এরপর তিনি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তান চলে যান। ১৯৮৬ সালের ৩০ জুন শাহেদ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে মু বাল্লেগ হিসেবে তার পদায়ন হয়। অত্যন্ত সুললিত ও দরদভরা কণ্ঠে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং জামা'তের একজন তেজোদীপ্ত সেবক ছিলেন। তার সেবাকাল প্রায় ৩৫ বছর বিস্তৃত। তার স্ত্রী বলেন,আমাকে বলতেন, আপনি শুধু একজন মুরব্বীর স্ত্রী নও, বরং আপনাকে জামা'তের কাজেও ক্ষেত্রেও অগ্রসর থাকতে হবে। অতঃপর তার ব্যাপারে লিখেন, খিলাফতের প্রতি তার আনুগত্য ও ভালোবাসা লক্ষনীয় ছিল। ছোট-বড় সবার সাথে অত্যন্ত সম্মানপূর্ণ আচরণ করতেন। যখনই কোন আহমদীর সাথে কথা বলতেন, সর্বদা জামা'তের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার উপদেশ দিতেন আর অধিকহারে জামা'তের সেবা করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। যখনই কোন অ-আহমদীর সাথে সাক্ষাৎ হতো, তাকে অবশ্যই তবলীগ করতেন আর একান্ত ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে কথা বলতেন, যাতে অন্যরাও আনন্দিত হতো। অসুস্থতার দিনগুলোতেও ফজরের নামাজের দেড়-দুই ঘণ্টা পূর্বে উঠে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন এবং কুরআ ন তিলাওয়াত করতেন। এরপর যতদিন শক্তি-সামর্থ্য ছিল পায়ে হেঁটে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। তার ছেলে উমর ফারুক সাহেব জামা'তের মুরব্বী সিলসিলা ও জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ায় শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বলেন,ঘরে এবং বাইরেও চলাফেরার সময় প্রায়ই কুরআন করীমের কোন না কোন অংশ সুললিত কণ্ঠে পড়তে থাকতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর পুস্তকের অনুবাদ ও প্রুফ রিডিং-এর কাজও তিনি করেছেন। আর এই সময়, বিশেষত যখন অনু বাদের কাজ করতেন তখন অধিকহারে কাসীদা পাঠ করতেন। মহানবী (সা.)-এর জীবনী ও ঘটনা শুনানোর সময় চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে যেত। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন সময় আমাকে আহমদীদের বিভিন্ন পরীক্ষা, দুঃখ-দুর্দশা ও কুরবানীর ঘটনা শুনাতেন। অনেক সময় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সমূহ বর্ণনা করতেন যে, কীভাবে তিনি কষ্ট সহ্য করেছেন।

তার ছোট ছেলে জাফর উল্লাহ খান বলেন, অত্যন্ত বড়মনা ও নির্ভীক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন কাটিয়েছেন। সর্বদা স্বল্পেতুষ্টিকে প্রাধান্য দিতেন। আল্লাহ্‌তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন।পরবর্তী জানাযা সাবিহা হারুন সাহেবার, যিনি মরহুম সুলতান হারুন খান সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । সাবিহা হারুন সাহেবার বংশে আহমদীয়াত তার পিতার বয়আতের মাধ্যমে এসেছিল। তিনি নিজে বুঝেশুনে ১৮ বছর বয়সে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। অতঃপর তার দাদা পুত্রের বয়আত করার পর বয়আত করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তিন পুত্র ও তিন কন্যা দান করেছেন। তার এক ছেলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) -এর জামাতা। তার বড় ছেলে সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব বলেন, আমার মাতার সবচেয়ে বড় ছেলে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মাত্র দুই বছর বয়সে মৃ ত্যুবরণ করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার জানাযার সময় বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে উত্তম পরিপূরক পুত্র সন্তান দান করবেন, যে সুদর্শন হবে আর একইসাথে দীর্ঘজীবন লাভ করবে। তিনি তাঁর স্বামীকে বলেন আমি সেই পুত্রকে এক যুবক হিসেবে তোমার কাঁধ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। অতঃপরতার ছেলে সুলতান আহমদ খান বলেন, আমার সৌভাগ্য যে, শিশুকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমার অনেকটা সময় মায়ের সাথে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি অনেক স্নেহশীল আর মার্জনাশীল মা ছিলেন । কখনো কারো গীবত করতেন না। তার মেয়ে মাহমুদা সুলতানা বলেন, আমার মা নেক ও নীরব প্রকৃতির এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন। জামা'তের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা পোষণকারিণী ও খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার পরম মার্গে উপনীত একজন নারী ছিলেন আর অন্যদেরও এই উপদেশই দিতেন। সর্বদা হাসি-খুশি ও আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনাকারী ছিলেন। তার আতিথেয়তা পুরো বংশের মাঝে বিখ্যাত ছিল। কারো মনে আঘাত দিতেন না। গীবতকে খুবই অপছন্দ করতেন আর আমাদেরকে সবসময় তা এড়িয়ে চলার নসীহত করতেন। এমন আসর যেখানে গীবত করা হতো সেখান থেকে তৎক্ষনাৎ উঠে যেতেন আর তার চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ প্রকাশ পেত। সর্বদা ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করতেন। তিনি বলেন, আমার পিতার ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণকারীর জন্যও তিনি কখনো বদ দোয়া করেন নি। সর্বদা বলতেন, আমি দোয়া করি আল্লাহ্ যেন তাদেরকে হেদায়েত দান করেন। দরিদ্র রোগীদের জন্য তার হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল আর তাদেরকে এমনভাবে সাহায্য করতেন যেন বাম হাতও তা জানতে না পারে।তার দ্বিতীয় কন্যা ওয়াজিহা সাহেবা বলেন, নীরব প্রকৃতির অধিকারী একজন নারী ছিলেন, অনেক বেশি দান-খয়রাতকারী ছিলেন আর দান-খয়রাত নীরবে করতেন এবং এর উল্লেখ করা পছন্দ করতেন না। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন। (আমীন)

****

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সিঙ্গাপুর সফর

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, হুযুরের অস্ট্রেলিয়া আগমণের হেতু কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন- আমি যেখানেই যাই, আমার মূল লক্ষ্য থাকে, জামাতের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করা, তাদের অগ্রগতি ও ব্যক্তিগত সমস্যাবলীর নিরীক্ষণ করা এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেওয়া। আমি তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতও করি যার ফলে তাদের সম্পর্কে জানতে পারি। আর যেখানে বেশি সংখ্যায় মানুষ একত্রিত হয়, সেখানে জলসার আয়োজন হয়, সেখানে আমার ভাষণ থাকে।যার মাধ্যমে আমি তাদেরকে এই উন্নত চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করি যে, যেখানে আপনারা বসবাস করেন, সেটিই আপনার দেশ, সেই দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং দেশীয় আইন মেনে চলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আঁ হযরত (সা.) এর উক্তি মতে দেরে প্রতি ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে অস্ট্রেলিয়ান কমিউনিটির মধ্যে জামাত আহমদীয়া কি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় যা প্রত্যেক সমাজে গ্রহণযোগ্য। কেননা আমরা প্রকাশ্যে একথা ঘোষণা করি যে, আমরা যে দেশে থাকি, সেই দেশকে ভালবাসি আর দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অংশ। দ্বিতীয়ত আমরা দেরে আইন মেনে চলি। আমাদের বাণী শান্তির বাণী। আমাদের উদ্ঘোষ -ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো তরে। তাই আমি মনে করি, কেউ আমাদেরকে অপছন্দ করে না। আমাদেরকে সর্বত্র সমাদরের দৃষ্টিতেই দেখা হয়।

প্রশ্ন: পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন-আমি যেখানেই সুযোগ পাই সকলকে বলি ন্যায় নীতিই শান্তি এনে দিতে পারে। আর ন্যায় নীতি সেটিই যা কুরআন করীম বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ যদি তোমাকে নিজের বিরুদ্ধে, নিজ আত্মীয় ও নিকট জনের বিরুদ্ধেও সাক্ষী দিতে হয়, তবু সাক্ষী দাও। এটি প্রকৃত ইসলাম। এর মাধ্যমেই সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিরিয়া প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন- সিরিয়াতে শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন উভয় পক্ষ, অর্থাৎ সরকার ও বিদ্রোহীরা পরস্পরের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে। এবং ভদ্রতার সীমা বজায় রেখে আলোচনা করবে।

দুই তিন সপ্তাহ পূর্বে আমি খুতবায় এ বিষয়ে কথা বলেছিলাম এবং এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলাম যে, ততক্ষণ পর্যন্ত সিরিয়া সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়,যতক্ষণ না উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে।

সিরিয়া আলিপন্থী এবং সুন্নীপন্থী-এই দুই প্রধান ফির্কা রয়েছে। বর্তমান সরকার আলিপন্থী। যদিও সরকারে কিছু সুন্নীপন্থীও আছে। তথাপি, সুন্নীদের অধিকার আত্মসাৎ করা হচ্ছে, তাদেরকে সেই সম্মান দেওয়া হয় না যার কারণে তারা বিচ্ছিন্নতার পন্থা অবলম্বন করছে।

হুযুর বলেন, সুন্নীরা যদি ক্ষমতায় আসে, সরকার গঠন করে, তবু এরা ন্যায় সঙ্গতভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না।

সম্প্রতি বিরোধী সংগঠনগুলি আল কায়েদা, তালিবানের মত উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছে। যার কারণে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে। তাই সরকার এবং এবং বিদ্রোহীরা যদি না নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করে এবং ন্যায়নীতি অবলম্বন করে, তবে দেশের শান্তি পরিস্থিতি ধ্বংস হয়ে যাবে। যার প্রভাব পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশেও পড়বে এবং শান্তি বিঘ্নিত হবে।

খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়া প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও আমি জানতাম না যে, আমি এই পদে আসীন হব। একটি নির্বাচনী বোর্ড খিলাফতের নির্বাচন করে। নির্বাচনের পূর্বে কেউ জানতে পারে না যে কার নাম উপস্থাপিত হবে। সেখানেই নাম উপস্থাপন করা হয় এবং নির্বাচন হয়। যার পক্ষে বেশি ভোট পড়ে,সেই খলীফার পদে আসীন হয়। নির্বাচনী বোর্ডের বাইরের সদস্যও নির্বাচিত হতে পারে।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

প্রশ্ন: একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, ইসলাম সমস্ত ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের বিশ্বাস, ইসলাম হল সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এটি সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ ধর্ম। কুরআন করীম শেষ ধর্মগ্রন্থ এবং আঁ হযরত (সা.) শেষ নবী। তাঁর পর আর কোন শরিয়তধারী নবী আসতে পারে না। কিন্তু শরিয়তবিহীন নবী আসতে পারে আর আঁ হযরত (সা.) এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন এমন এক যুগ আসবে যখন নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআনের অক্ষরসমূহ ছাড়া কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুস ভুলে যাবে। তাদের মসজিদসমূহ বাহ্যত নামাযীতে পরিপূর্ণ হবে, কিন্তু সেগুলি হবে হিদায়তশূন্য। এমন যুগে আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ কে পাঠাবেন যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরবেন, ইসলাম স্বরূপ উদ্ঘাটন করবেন। তোমরা তাকে গ্রহণ করো এবং তাকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। আমাদের বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী এসে গিয়েছিলেন, যিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহম কাদিয়ানী। ১৮৮৯ সালে তিনি জামাতের ভিত্তি রাখেন। আমরা তাঁকে শরিয়তবিহীন নবী হিসেবে বিশ্বাস করি। অপরদিকে অন্যান্য মুসলমানেরা তাঁকে মেনে নেয় নি, প্রত্যাখ্যান করেছে। আমরা তাকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে মেনেছি। কিন্তু অন্যান্য মুসলমানেরা এখনও অপেক্ষা করছে। আমাদের দাবি, যার আসার কথা ছিল, তিনি এসে গিয়েছেন। এখন আকাশ থেকে কেউ আসবে না। কুরআন করীম ঘোষণা করছে, প্রত্যেক ব্যক্তি মরণশীল। 'কুল্লু নাফসিন যায়েকাতুল মাউত'। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। হযরত ঈসা (আ.)ও মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আমরা মসীহ মওউদ কে মেনে সোজা পথে রয়েছি, আমরা হিদয়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উপর ইলহাম হয়েছিল যে, 'ধরাপৃষ্ঠের সকল মুসলমানকে এক ও অভিন্ন ধর্মের উপর একত্রিত করা হবে।' আর সেই অভিন্ন ধর্ম হল ইসলাম। আর আপনারা যারা ওয়াকফে নও, তাদের দায়িত্ব হল সেই বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার করা। জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দিচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রতি বছর আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরে ইসলামের নাম সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে।

একজন খাদিমের প্রশ্ন: পড়াশোনা শেষ করে নিজের ব্যবসা চালিয়ে যেতে চাই। এতে হুযুর বলেন, এবিষয়ে কেন্দ্রকে লিখিতভাবে জানান। এরপর খলীফাতুল মসীহ সিদ্ধান্ত নিবেন যে অনুমতি দেওয়া হবে কি না।

একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, আমাদের এই পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহেও প্রাণের স্পন্দন আছে। এমতাবস্থা রসুলুল্লাহ্ (সা.) সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য রহমতুল্লিল আলামিন কিভাবে হলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, অতীতের রসুলদের জন্য আলামীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ কিছু কিছু নবীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন- 'ওয়া কুল্লান ফাযযালনা আলাল আলামীন।' অর্থাৎ আমরা তাদের সকলকে সমগ্র জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন- 'আলামীন বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সব জগত যা সম্পর্কে মানুষ অবগত আছে। অর্থাৎ মানুষ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে, ততদূর পর্যন্ত তারা রহমতুল্লিল আলামীন। এছাড়া অন্যান্য জগত পর্যন্ত পৌঁছনোর জন্য খোদা তা'লা কি পন্থা রেখেছেন তা তিনিই ভাল জানেন।

একজন খাদিমের প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার বলেছেন, আপনারা যদি হাত খরচ বাবদ কিছু টাকা পান তা থেকে ওসীয়ত করুন। আর যদি কিছু না পান এবং উপার্জনও না করেন, সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- তিন জন শহীদের ঘটনার পূর্বের কেউ জানত না। কিন্তু এখন সারা পৃথিবী জানে যে ইন্ডোনেশিয়ায় পাকিস্তানের মত চরমপন্থী রয়েছে। এখন অনেকগুলি এন.জি.ও ইন্ডোনেশিয়াকে সেই সব দেশের তালিকায় রেখেছে যেখানে মানবাধিকার লাঞ্ছিত হচ্ছে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইজতেমার অনুষ্ঠানে হুযুরের ভাষণ

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় এ সপ্তাহে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্য ন্যাশনাল ইজতেমার অনুষ্ঠান করছে। কোভিডের কারণে এক বছর ব্যবধানে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। এবছর জলসা সালানা যুক্তরাজ্যের পূর্বে অনেক আহমদী তাদের এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, এবছর জলসা হওয়া উচিত। পরবর্তীতে তারা জলসা সালানার বরকতময় পরিবেশ দেখার সুযোগ পেয়েছে। আপনাদের অনেকেরই খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা সম্পর্কে একই ধরনের অনুভূতি হবে যেমনটা লোকদের জলসা সম্পর্কে ছিল। আর এখন আল্লাহ্ তা'লার ফজলে আপনাদের ইজতেমা হয়ে গেছে বা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অধিবেশনে আপনারা আশা করি তা উপভোগ করে থাকবেন। যা হোক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বুঝতে হবে আর তা হল ইজতেমার প্রধান উদ্দেশ্য শুধু খোদ্দাম এবং আতফালদের সমবেত হওয়া নয় বা কেবল সঙ্গ উপভোগ করা ইজতেমার উদ্দেশ্য নয়। বরং ইজতেমার মূল এবং প্রধান বা সত্যিকারের উদ্দেশ্য হল, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করা। অংশগ্রহণকারীদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে উন্নতি হল ইজতেমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইজতেমা এমন একটি জায়গা যেখানে এসে আপনারা জাগতিকতাকে বাদ দিয়ে ধর্মের দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পান। আর আপনারা সে সমস্ত বক্তৃতা এবং প্রতিযোগিতা আর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি করার সুযোগ পান। আমি যেভাবে বলেছি আমরা গত মাসে যুক্তরাজ্যে জলসা সালানা করতে পেরেছি। দু'এক বছর ব্যবধানে এ জলসা হয়েছে।

আপনাদের অনেকেই তখন বিভিন্ন বক্তৃতা শুনেছেন বা শুনে থাকবেন। জলসার উদ্দেশ্য ছিল জলসায় অংশগ্রহণকারীদের আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় জ্ঞান যেন বৃদ্ধি পায়। আমি নিশ্চিত, জামা'তের অনেক সদস্য তারা হোক পুরুষ বা নারী, হোক ছোট বা বড়– তারা জলসার বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন। সত্যিকার অর্থে অনেকে আমার কাছে পত্রে লিখেছেন যে, আমার বক্তৃতা এবং আরও কিছু বক্তার বক্তৃতা খুবই জোরালো ছিল এবং তাদের হৃদয়ে তাদের অন্তঃকরণে তাদের মন–মস্তিষ্কে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

জলসা কীভাবে তাদেরকে আধ্যাত্মিক মান উন্নত করার ব্যপারে এবং তাকওয়ার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছে– তারা অনেকেই আমাকে তা লিখেছে। যেখানে এটি আমাদের জন্য উৎসাহব্যাঞ্জক সেখানে মনে রাখতে হবে যে, এমন আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক পরিবর্তন যেন সাময়িক না হয় আর ধর্মীয় এই পরিবর্তন যেন স্থায়ী হয়। আবারও বলছি, যারা এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন এ ইজতেমাগুলো শুধু সামাজিক বা বিনোদনমূলক কার্যক্রমের জন্য অংশগ্রহণ করেন না। বরং বিভিন্ন অঙ্গাসংগঠন তাদের যে ইজতেমা করে থাকে, এর উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিকভাবে সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা। যে কার্যক্রমগুলো সদস্যদের বয়স অনুসারে এবং বোধ–বুদ্ধির মান অনুসারে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় যেন সদস্যরা তাদের সাথীদের সাথে সময় কাটাতে পারে, তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য চিন্তা করতে পারে, ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যেন প্রণিধান করতে পারে। এগুলো করা হয় বিশেষ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার বিষয়টি মাথায় রেখে, জামা'তের প্রত্যেক অঙ্গাসংগঠনের সদস্যরা যেগুলোর সম্মুখীন হয়ে থাকেন। আর সে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার পদ্ধতি যেন তারা শিখতে পারে। এভাবে তারা যেন আল্লাহ্ তালার নির্দেশ সর্বোত্তমভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। সকল অঙ্গাসংগঠন যে ইজতেমা আয়োজন করে থাকে, উক্ত বিষয়গুলোই ঐসকল ইজতেমার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ইজতেমার অনুষ্ঠানের আরেকটি উদ্দেশ্য হল, এটি নিশ্চিত করা যে, সব আহমদী আবালবৃদ্ধবণিতা যেন বুঝে যে, তারা সবাই জামা'তের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি আশা করব এবং দোয়া করব যে, আপনারা ইজতেমার কার্যক্রমে সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং আপনাদের সাধ্যমত প্রতিযোগিতায় অংশ নিবেন। এবছর কিছু সাবধানতার কারণে শুধু ১২ থেকে ১৫ বছরের আতফালদের ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমি আশা করি ভবিষ্যতে এমন নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হবে। কিন্তু ১২ থেকে ১৫ বছর বয়স্কদের অনুমতি দেওয়া আবশ্যক ছিল কেননা ধর্মীয় এবং নৈতিক উন্নতির জন্য এ বয়সটি খুবই গুরুত্ববহ। এছাড়া ধর্মীয় এবং নৈতিক উন্নতির জন্য ইজতেমায় অংশগ্রহণ আবশ্যক। বিভিন্ন কার্যক্রমে এবং প্রোগ্রামে তারা অংশগ্রহণ

করে থাকবেন যা তাদের প্রয়োজন সামনে রেখে অনুষ্ঠান করা হয়েছে। আমি আশা রাখি আতফালরা জামা'তের দৃষ্টিতে তাদের যে মর্যাদা আছে বা গুরুত্ব আছে তা বুঝতে পারবে। সত্যিকার অর্থে সকল খোদ্দাম এবং সব আতফালদের বুঝা উচিত যে, তারা জামা'তের খুবই মূল্যবান সদস্য। আর সত্যিকার অর্থে প্রত্যেক আহমদী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)–এর জামা'তের মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এ মূল্য সুরক্ষিত থাকবে না যদি সাবধান না থাকা হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)–এর জামা'তের সম্মান রক্ষার জন্য আপনাদের সবাইকে অসামান্য ভূমিকা পালন করতে হবে। আর জামা'তের অব্যাহত উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য সবার ভূমিকা পালন করার আছে। চিরন্তন সত্য হল, প্রত্যেক জাতির সব বয়সের যুবকদের জামা'তের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অসাধারণ ভূমিকা পালন করার থাকে। এমন জামা'ত, যাদের শিশুরা এবং যুবকরা সেবা এবং আত্মনিবেদনের প্রেরণায় সমৃদ্ধ থাকে তারাই সাফল্যের চূড়ায় বা চূড়ান্ত মার্গে উপনীত হয়। সত্যিকার অর্থে জামা'তের অব্যাহত উন্নতি ও অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) অঙ্গাসংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠা করেছেন যথা: আনসার, লাজনা, খোদ্দাম ইত্যাদি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছেন, যদি কেন্দ্রীয় জামা'ত এবং অঙ্গাসংগঠনগুলো নিজেদের কাজ করতে গিয়ে পুরো শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগায় তাহলে জামা'তের উন্নতি ও অগ্রগতি বা জামা'তের লক্ষ্য দ্রুত অর্জিত হবে। তিনি (রা.) আরও বলেছেন, যদি অঙ্গাসংগঠনগুলো প্রহরী হিসেবে কাজ করে এবং এটি নিশ্চিত করে যে জামা'তের উন্নতির গতি যেন থেমে না যায়। কোন দুর্বলতা যদি থাকে বা অলসতা থাকে কেন্দ্রীয় জামা'তের মাঝে থাকে তাহলে অঙ্গাসংগঠন জামা'তের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পতাকা নিজেদের হাতে বহন করবে। আর এভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)–এর জামা'তের উন্নতি এবং অগ্রগতির সফর অব্যাহত থাকবে। এ কথাগুলো কোন অলীক কথা নয়। আমরা কার্যত এগুলো হতে দেখেছি। যেমন কোন কোন জামা'তের কর্মকর্তা বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে তারা সাবধান হয়ে যায়। বা তাদের আচার–আচরণ অনেক কঠিন হয়ে যায় এবং তারা অতি সাবধান থাকে। সাবধানতা কোন কোন ক্ষেত্রে আবশ্যক। প্রতিটি সিদ্ধান্ত সঠিক সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে নেওয়া উচিত। কিন্তু কোন ব্যক্তির আলস্যকে সাবধানতা নাম দেওয়া উচিত নয়।

তাই আলস্য যদি কোন পর্যায়ের সদস্যদের ভিতর ঢুকে যায়, কোন সদস্য যদি অলস হয়ে যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের কোন পুরুষ যদি অলস হয়ে যায়, দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অলসতা করে, তাহলে পুরুষের মহিলারা এগিয়ে এসে তারা সক্রিয় হয়ে সেই শূন্যতা দূর করতে পারে এবং তারা অধিক উদ্দীপনা নিয়ে জামা'তের কাজ করতে পারে। খোদ্দামরা যদি দুর্বলতা দেখায় তাহলে তাদের লাজনারা যেন অধিক সক্রিয় হয়ে দায়িত্বপালন করে। আবার যদি লাজনা এবং আনসাররা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে তাহলে খোদ্দামুল আহমদীয়া এগিয়ে আসতে পারে। আল্লাহ্ না করুন, যদি তিন অঙ্গাসংগঠনই অলস হয়ে যায় বা দুর্বল হয়ে যায় তাহলে কেন্দ্রীয় প্রশাসন বা প্রেসিডেন্ট বা আমীরের অধিনে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্বে সক্রিয় করবে। আবার অন্যদিকে কেন্দ্রীয় জামা'ত যদি কোন দুর্বলতা দেখায় তাহলে যেসব অঙ্গাসংগঠন রয়েছে তারা জামা'তের কাজ যেন সচল থাকে সেটি নিশ্চিত করবে। জামা'তের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য কেন্দ্রীয় এবং মূল জামা'তের অঙ্গাসংগঠনগুলোর সর্বোচ্চ মেধা এবং সামর্থ্য প্রয়োগ করা উচিত। তারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেবে যাতে জামা'তের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে থাকে।

আর একইভাবে ইসলামের বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছানোর কাজও করা উচিত। মূল জামা'ত এবং অঙ্গাসংগঠনগুলো যদি এভাবে কাজ করে এবং কাজ করা অব্যাহত রাখে তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জামা'তের উন্নতিকে কোন কিছু বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)–এর লক্ষ্য অর্জনের পথে কেউ বাধ সাধতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আমি সবসময় লক্ষ্য করি, যেসব দেশের সকল স্তরের প্রশাসন সক্রিয়, সেখানে জামা'তের উন্নতি এবং অগ্রগতি দ্রুত হয়। আবার অন্যদিকে যেখানে আলস্য দেখায় সেখানে উন্নতির গতি থেমে যায় বা ধীরগতিতে উন্নতি করে। জামা'তের আমেলা সদস্য হোক বা অঙ্গাসংগঠনের সদস্য হোক, তাদের সবসময় চিন্তা করা উচিত, মসীহ্ মাওউদ (আ.)–এর মিশনকে সফল করার জন্য প্রত্যেকের নিজেদের ভূমিকা রাখতে হবে। আপনাদের সকলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)–এর হাতে বয়আত করেছেন। আর এই অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়েছেন যে, আপনারা ধর্মকে সমস্ত জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবেন। যদি কাজ করা না হয় তাহলে এমন অঙ্গিকারের কোন অর্থ

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Azkarul Islam, Amaipur (Birbhum)**

ডেনমার্কের মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার সঙ্গে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ভার্চুয়াল মিটিং

গত ১৪ আগস্ট ২০২১ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ডেনমার্কের সদস্যরা ভার্চুয়াল মোলাকাতে হুযূর (আই.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর (আই.)-কে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিল।

প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম প্রিয় হুযূর, আমার প্রশ্ন হল, করোনা মহামারির কারণে অনেক জামা'তী প্রোগ্রাম করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু দুই বছর পর এবছর জলসা সালানা যুক্তরাজ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে, এই দুই বছর পর জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হওয়ায় আপনার অনুভূতি কি?

প্রিয় হুযূর (আই.): খুবই ভাল লেগেছে, এবছর জলসা সালানা হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। আলহামদুলিল্লাহ্ পড়েছি এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি। কেননা তিনি আমাদের সীমিত পরিসরে হলেও জলসা সালানা করার তৌফিক দিয়েছেন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জামা'তে গঞঅ'র মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় একত্র হয়ে এবং নিজের ঘরে বসেও মানুষ জলসা দেখেছে। অনেক মানুষ আমাকে লিখেছে যে, তারা নিজেদের ঘরে বসে একত্র হয়ে জলসা দেখেছে এবং জলসা সালানার মত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। অনেকেই লঙ্গর খানার মত আলু-গোশ্ত এবং ডাল তৈরি করেছেন। অনেক জায়গায় জামা'তী ভাবেও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এভাবে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী লাখ লাখ মানুষ জলসা দেখেছে।

যারা জামা'তী ব্যবস্থাপনায় সমবেত হয়ে জলসা দেখেছে তাদের সংখ্যাও লাখের অধিক। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা করোনার পর এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। আর ভবিষ্যতের জন্য নতুন দ্বারও উন্মুক্ত হয়ে গেছে। মানুষ ভাবছিল জলসা কীভাবে হবে? কবে হবে?। আর জামাতের ওপর হতাশা আর কষ্টের যে ছায়া পড়েছিল সেই ছায়া দূর হয়ে গেছে। যখন জামাতের সদস্যদের মধ্যে থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়, তখন আমি স্বাভাবিকভাবেই আনন্দিত হয়েছিলাম। আমার মনে হয় তোমরাও আনন্দিত হয়েছিলে। কি তোমরা খুশি হয়েছিলে না?

প্রশ্নকারী: জ্বী হুযূর অবশ্যই খুশি হয়েছিলাম। জাযাকাল্লাহ্ হুযূর। প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হল, আফগানিস্তানের যুদ্ধের পর পৃথিবীর ওপর কী প্রভাব পড়বে?

প্রিয় হুযূর (আই.): আফগানিস্তানে গত ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে যুদ্ধ হচ্ছে। এখানের অবস্থাই এরকম। অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হতেই থাকে। আফগানিস্তানের এই অবস্থা তখন থেকে চলমান, যখন মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাহেবযাদা আবদুল লতিফের (রা.) শাহাদাতের পর বলেছিলেন যে, হে কাবুলের মাটি তুমি কখনও শান্তিতে থাকবে না। অতএব, তখন থেকেই এই মাটির শান্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই অস্থিতিশীল অবস্থা এখনও চলমান। আর এখন তালেবানরা শাসনে এসেছে। দেখা যাক তারা কীভাবে শাসন পরিচালনা করে। আর কতদিন অন্যান্য জাতির সরকার তাদের সাথে কাজ করতে পারে!

আজকাল, যেকোন সরকার যতদিন বৈশ্বিক সরকার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তারা ঠিকভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করতে পারে না। পৃথিবীর সকল দেশ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল। তাদের মাঝে আন্তঃব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। এই জিনিসগুলো তালেবানকেও ভাবতে হবে। তারা যদি ঠিকভাবে সরকার পরিচালনা করে, তাহলে তারা পৃথিবীর সাথে কিছুদিন চলতে পারবে। কিন্তু তাদের উগ্রবাদী চিন্তা চেতনার কারণে মনে হচ্ছে কিছু দিন পর সেখানে পুনরায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তাদের মাঝ থেকেই কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে যাবে। এমনকি এখনই ক্ষমতা পাবার পরই যেভাবে তালেবানরা আফগানিস্তানের পতাকা ভূপাতিত করে তালেবানের পতাকা উড্ডয়ন করেছে; তারা তো দেশ বিজয় করে নি, তাদের আফগানিস্তানের পতাকা উড্ডয়ন করাই উচিত ছিল। অনেকেই এই হীন কর্মের প্রতিবাদ করেছে আর মিছিলও করেছে। তারা আফগানিস্তানের পতাকাও পুনঃউড্ডয়ন করেছে। যার ফলে যতটা খবরে এসেছে তালেবানরা তাদের ওপর গুলি চালিয়েছে এবং কিছু লোক মারাও গেছে। অতএব, এখনও সেখানে ব্যাপক অস্থিতিশীল অবস্থা চলমান। প্রশ্ন হল, পৃথিবীর ওপর এর কি প্রভাব পড়বে? এই কারণে প্রথমত দেশে অস্থিতিশীল অবস্থা আরও বেড়ে যাবে, যদি তালেবানরা তাদের কট্টরনীতি পরিবর্তন না করে, শান্তি এবং সহনশীলতার নীতি অবলম্বন না করে। অন্যদিকে যদি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ মনে করে যে, তালেবানরা পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ তাহলে অন্য কোন না কোন রাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করবে। সর্বপ্রথম রাশিয়া ছিল, যখন তারা ছেড়ে দিল তখন আমেরিকা দখল করেছিল, এখন আমেরিকা ছেড়ে দিয়েছে, এখন হয়ত চীন তাদের ক্ষমতা প্রমাণের জন্য সেখানে হস্তক্ষেপ করবে। একইভাবে অন্যান্য রাষ্ট্র আসবে তারাও হস্তক্ষেপ করবে। এই পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক রাজনীতিতে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন আসবে। এই এলাকার গুরুত্বের কারণে অন্যান্য দেশ আফগানিস্তানকে দখল করতে চাইবে কিন্তু এসব কিছু তালেবানের রাষ্ট্রনীতির ওপর নির্ভর করছে। এখন দেখা যাক সামনে আর কী হয়। তখন বুঝা যাবে। দু-চার মাসেই সকল অবস্থা বুঝা যাবে।

প্রশ্ন: কোন কোন বিজ্ঞানী বলে থাকেন যে, করোনার কারণে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। আমার প্রশ্ন হল, হুযূর এই বিষয়ে আপনি কি মনে করেন আর করোনার কারণে আপনার জীবনে কী পরিবর্তন এসেছে?

প্রিয় হুযূর (আই.): আমার জীবনে কোন পরিবর্তন আসে নি। বিজ্ঞানীরা একথা তাদের জন্য বলেছেন, যারা জাগতিক চিন্তাচেতনায় মগ্ন এবং যারা নাইট ক্লাবে না গিয়ে থাকতে পারে না বা যারা একত্র হয়ে মদ পান না করে থাকতে পারে না। যারা হৈ-হুল্লোড় আর নাচ গান না করে বাঁচতে পারে না। যখন এসব কাজে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তখন তারা সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে।

যখন কোন রোগ মহামারি আকার ধারণ করে আর সারা পৃথিবীতে এভাবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর একটি বিরূপ প্রভাব পড়ে যে, আমরা বাঁচব কি বাঁচব না। কিন্তু যদি মানুষ এটি জানে যে, জীবন-মৃত্যু আল্লাহ্ তা'লার হাতে। আর যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত প্রতিরোধব্যবস্থা তারা পালন করে আর চিকিৎসাব্যবস্থার মাধ্যমে উপকৃত হয়, তাহলে জাগতিক কিছু জিনিস না পেলে, কিছু কাজ না করতে পারলে বা দৈনন্দিন রুটিন পরিবর্তন হওয়ার কারণে; হ্যা এগুলো স্বাভাবিকভাবে সামান্য হলেও অস্থিরতা বাড়ায়। কিন্তু এসব কারণে কারও খুব বেশি দুশ্চিন্তা বা অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত যেন তিনি এই অবস্থা দ্রুত ঠিক করে দেন এবং পৃথিবীর মানুষ যেন আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, কেউ যদি মহামারির কারণে হতাশায় ভুগে তাহলে তাও দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয় (১৩ঃ২৯)। তাই এই অবস্থায় বেশি বেশি আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত হওয়া উচিত। কিন্তু জাগতিক মানুষ আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। তাই তাদের ওপর বেশি বিরূপ প্রভাব পড়ে। আর এই দিনগুলোতে আমার রুটিনে পরিবর্তন বলতে, আমার সাথে সশরীরে সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া আমার রুটিনে কোন ধরনের পরিবর্তন হয় নি। আমার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজই কাজ থাকে। এত কাজ যে, আমার মনেই হত না বাহিরে মহামারি আছে কি না। আর যতটা মোলাকাতের কমতি ছিল, সেটা এভাবে তোমাদের সাথে ভার্চুয়াল মোলাকাত করে আমি পূরণ করে নিই। কমপক্ষে সপ্তাহে দুদিন এইভাবে কেটে যায়। এছাড়া আরও ব্যস্ততা থাকে, অফিসিয়াল মোলাকাত থাকে। এছাড়া পত্র বিনিময়, উত্তর দেওয়ার কাজ থাকে। এই সকল কাজ আল্লাহ্‌র কৃপায় চলতে থাকে। আহমদীয়া জামা'ত এখন অনেক দেশে বিস্তৃত। তাদের সবার কাজ দেখা, নির্দেশনা দেওয়ায় সময় কীভাবে চলে যায় তা বোঝাই যায় না। বরং সময় বেশ কম মনে হয় আর কাজ অনেক বেশি মনে হয়।

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হল, আপনার সকল কাজ সামলানো কি আপনার কাছে খুব কঠিন মনে হয়?

প্রিয় হুযূর (আই.): যদি সকল কাজ সঠিক সুচারুরূপে করতে হয়, তাহলে কাজ কঠিন হবেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সকল কাজ সহজ করে দেন। আর সব কাজ সহজভাবেই হয়ে যায়। আমি দিনের কাজ দিনেই শেষ করি কিন্তু তবুও চিন্তা থাকে যে, সঠিকভাবে কাজ করতে পারছি তো। অন্যথায় আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভাগীদার হতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কঠিন কাজ। তুমি যদি সব কাজ সুচারুরূপে করতে চাও, তাহলে কাজ অবশ্যই কঠিন লাগবে আর এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হল, আজকাল করোনা মহামারির কারণে অনেক ঘরেই বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা হচ্ছে। এসব সমস্যার সমাধান কি?প্রিয় হুযূর (আই.): ঘরে কী সমস্যা হচ্ছে? পারস্পরিক ঝগড়াবিবাদ। প্রকৃত পক্ষে এই করোনা মহামারিতে আমাদের আল্লাহ্‌র প্রতি আরও বিনত হওয়া উচিত। যদি এই মহামারি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের পারস্পরিক সম্মান, ভালবাসা ওশ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, তওবা করা উচিত এবং পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত, যাতে আল্লাহ্ তা'লা এই শাস্তি, মহামারিকে দূর করে দেয়। আর যদি এটি আমাদের জন্য কোন পরীক্ষা হয়, সেক্ষেত্রেও আমাদের আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা উচিত, যাতে আমরা এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারি এবং আমাদের মাঝে যেন পারস্পরিক ভালবাসা তৈরি হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পারস্পরিক খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

(ক্রমশ.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 11 Nov, 2021 Issue No.45

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

নেই। তাই আপনাদের সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করে এই অঙ্গিকারকে সত্য প্রমাণ করা উচিত। আপনাদেরকে আমাদের জামা'তের মূল লক্ষ্য সামনে রাখা উচিত। ইসলামের বাণী পৃথিবীর সকল প্রান্তে পৌঁছানো আর শান্তি ভালবাসা এবং ইসলামের শিক্ষা সকল জাতিগোষ্টির মাঝে প্রচার করা আমাদের জামা'তের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য হিসেবে দৈহিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এবং মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আপনারা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছেন। অতএব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নিজেদের ভূমিকা এবং নিজেদের দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালন করা জামা'তের সার্বিক সাফল্যের জন্য আবশ্যক। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা যদি সর্বোচ্চ নৈতিক গুণাবলী ধারণ করে, যদি ধর্মকে প্রাধান্য দেয়, যদি ধর্মীয় জ্ঞান এবং জাগতিক জ্ঞান বৃদ্ধি করে, মোটের ওপর তারা যদি কুরআনের নির্দেশাবলী এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশাবলী মেনে চলে আর যুগ-খলীফার পুরোপুরি অনুগত হয় তাহলে আমাদের জামা'তের উন্নতির গতি অনেক বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের উন্নতি এবং মঙ্গল আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট। আপনাদের অনেকের ছেলে-মেয়ে আছে। নিজস্ব সন্তানও আছে। আর আপনাদের অনেকেই জামা'তের পরবর্তী প্রজন্মের তরবিয়তের জন্য দায়ী। তরবীয়তের দায়িত্ব আপনাদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। পিতার প্রকৃত গুরুত্ব এবং মূল্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রসূল করীম (সা.) বলেছেন, পিতা নিজ সন্তানকে নৈতিকভাবে তরবীয়ত করার চেয়ে মূল্যবান কিছু দিতে পারে না। যদি আপনি সন্তানের জন্য সর্বোত্তম ওসীয়্যত করে যেতে চান তাহলে প্রথমে আপনাকে নিজের প্রতি দেখতে হবে যে, আপনি পুণ্যপন্থা অনুসরণ করছেন কিনা। সন্তানকে যদি তরবীয়ত করতে হয় তবে প্রথমে নিজেকে সর্বোত্তম আদর্শ বানাতে হবে। যে সমস্ত খোদ্দামের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বয়সসীমার মধ্যে আছে তাদের মনে রাখতে হবে যে, তারা সরাসরি পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে। সম্প্রতি একটি ভার্চুয়াল মোলাকাতে এক খাদেম আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে, যদি বড় খোদ্দামরা সঠিক এবং পুণ্যপন্থা অনুসরণ না করে তাহলে ছোট খোদ্দামরা তাদেরকে কীভাবে গাইড করতে পারে? গত সপ্তাহের আনসারদের ইজতেমাতে আমি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। আজকের ইজতেমায় বলতে চাই, এমন সিনিয়র খোদ্দামদের এ বিষয়টি ভাবা উচিত। বিশেষকরে যাদের সন্তানসন্ততি আছে তাদের জন্য আরও চিন্তার বিষয়। আপনাদের আচার-আচরণ অন্যদেরকে প্রভাবিত করে না- এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। আপনারা কি করছেন তা পরবর্তী প্রজন্ম দেখছে। তাদেরকে আপনারা নিরাশ করবেন না। সবসময় স্মরণ রাখবেন, যদি আপনারা নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে এবং আল্লাহ্‌র দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সচেতন না হন এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের বিষয়ে সচেতন না হন, নিজেদের আধ্যাত্মিক মান, ধর্মীয় মান উন্নত করার চেষ্টা না করেন, তাহলে আপনারা শুধু নিজেরাই ক্ষতির সম্মুখীন হবেন না বরং আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মেরও ক্ষতির কারণ হবেন। পরবর্তী প্রজন্ম যদি পথভ্রষ্ট হয় অথবা বিভ্রান্ত হয়, তাহলে আপনারা এর জন্য দায়ী হবেন। রসূল করীম (সা.) বলেছেন, পিতা হলেন ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। পিতা যদি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার জবাবদিহি করবেন। সবসময় মনে রাখবেন, মু'মিনকে সবসময় দু'টি অধিকার প্রদান করতে হয়। যার একটি হল আল্লাহ্‌র অধিকার আর অপরটি হল বান্দার অধিকার। আপনি যদি এই দুটি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন তাহলে আপনি আপনার সন্তানসন্ততিকে অবশ্যই সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। আর আপনি খোদ্দামদের জন্য তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও কাজ করবেন, যারা আপনাদের গাইড মনে করে। তাদেরকেও সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম হবেন। অন্যদের দিকনির্দেশনা বা সঠিক পথপ্রদর্শন করার সফল উপায় হল নিজের আচারআচরণের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা। এছাড়া স্মরণ রাখবেন যে, কোন জামা'তের সাফল্য বা জীবন কোন এক প্রজন্মের ওপর নির্ভর করে না। বরং সে-সকল জাতি উন্নতি করে যারা নিজেদের মাঝে বিশেষ ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। আর এটা কেবল তারাই আনে যারা প্রজন্ম পরম্পরায় পরস্পরের তরবিয়ত করে এবং সকল প্রকার উন্নতির ও সাফল্যের জন্য কুরবানী করে। আর এমন জাতির উন্নতি কখনও থেমে থাকে না।

এছাড়া এমন মানুষ যারা যুগ-ইমামকে মসীহ মাওউদ হিসেবে মেনেছে এবং গ্রহণ করেছে তারা দাবী করে যে, আমরা রসূল (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষা সারা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। এই দাবী তখনই সত্য প্রমাণিত হবে যখন সব আহমদী কুরআনের শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে এবং রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী মান্য করার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে নিজেদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মান উন্নত করার চেষ্টা করবে। তাই আমাদের কোনভাবে বসে থাকার সুযোগ নেই। যেভাবে প্রত্যেক দিন সকালে সূর্য উদিত হয় ঠিক সেভাবে আমাদের প্রতিটি দিন যেন জামা'তের প্রতিটি সদস্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির সংবাদ নিয়ে সূর্য উদিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই পর্যায়ে পৌছতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আশ্বস্ত হতে পারি না। আপনাদের ব্যানারে আপনারা গর্বের সাথে একটি স্লোগান লিখেন। যেখানে মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন, যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে মানব জাতির সংশোধন হতে পারে না। এটি শুধু বুলিসর্বস্ব নয় বা মোটেও এমন নয় যা নিয়ে শুধু আমরা গর্ব করে বসে থাকব বরং এটি খোদ্দামুল আহমদীয়াকে অনুপ্রাণিত করা উচিত বা জাগ্রত করা উচিত। এই স্লোগান আপনাদের খোদ্দামের অনুষ্ঠানে পরিষ্কারভাবে ফলাও করে প্রচার করা হয় যেন এটি প্রত্যেক খাদেমের হৃদয়ে বা অন্তকরণে প্রোথিত হয়ে যায়। সত্যিকার অর্থে প্রত্যেক খাদেম কোন পদে থাকুক বা না থাকুক, এই শব্দগুলোকে নিজেদের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়া উচিত যে, আমি এগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত কি-না। তাদেরকে তাদের নিজেদের সংশোধন করে জাতির সংশোধনের জন্য ভূমিকা রাখা উচিত।

জাতীয় সম্পদে পরিণত হতে চাইলে আপনাদেরকে সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানে উপনীত হতে হবে নতুবা শুধু এ শব্দগুলো বুলি হিসেবে আওড়ানো অর্থহীন। আমি স্মরণ করাতে চাই, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সকল পর্যায়ের আমেলার সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে যদি নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করে তাহলে মজলিসের ওপর এর অসাধারণ প্রভাব পড়বে। বিশেষ কোন অনুষ্ঠান যদি আপনারা নাও করেন তবুও ব্যক্তিগত আদর্শের মাধ্যমে আপনারা অন্যদের জন্য হেদায়াতের কারণ হবেন। অন্য খোদ্দামরা দেখবে যে, আপনারা নিষ্ঠাবান। তখন তারা আপনাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করবে। আমি অল্পবয়স্ক ছোট খোদ্দামদের বলতে চাই আপনাদের এটি মনে করা উচিত নয় যে,আপনাদের বয়স কম, তাই ধর্মের বিষয়ে বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আর এ কথাও মনে করা উচিত নয় যে, আপনাদের এই বয়সে শুধু খেলাধুলায় মত্ত থাকলেই চলবে। আপনাদের অবশ্যই গঠনমূলক বিনোদনের অধিকার রয়েছে। অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু একইসাথে আপনাদের মনে রাখতে হবে, আপনারা সাবালক বয়সে পদার্পণ করতে যাচ্ছেন। সত্যিকার অর্থে অতীতকালে মানুষ শৈশবেই বিয়ে করত আর তাদের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পিত হত।

এছাড়া ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে কম বয়স্ক যুবক তথা ১৮-১৯ বছর বয়সের যুবকরা সে সময়কার বড় বড় যুদ্ধে কেবল অংশগ্রহণই করে নি বরং তাদেরকে কমান্ডার পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা অসাধারণ সাহস নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছে। অসাধারণ ঈমান তারা প্রদর্শন করেছে।

তাই আপনাদের যোগ্যতাকে খাটো করে দেখবেন না। ধর্মের বিষয়টি পরে দেখা যাবে- একথাও মনে করবেন না বরং যা করার তা এখনই করতে হবে। কিশোর হিসেবে এবং যৌবনের প্রারম্ভে আপনাদের নিজেদের যে গুরুত্ব আছে তা বুঝতে হবে। এরপর পাশাপাশি আহাদনামায় আপনারা পড়েন যে, আপনাদের বিশ্বাস, দেশ ও জাতির জন্য আপনারা সকল কুরবানীর জন্য প্রস্তুত। আপনারা শুধু মৌখিকভাবে উচ্চস্বরে শব্দগুলো আওড়াবেন না বরং আপনাদের কর্ম যেন এর সত্যায়ন করে। আপনারা যদি সত্যিকার অর্থে অঙ্গিকার করে থাকেন তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা দায়িত্ব হল নামায পড়া। ভাল খাদেম হওয়ার সবচেয়ে উত্তম মন্ত্র এটিই। দৈনিক পাঁচ বেলার নামায আপনাদের পড়া উচিত। আর সঠিক মনোযোগ না দিয়ে খুব তাড়াহুড়া করে নামায পড়বেন না। মনোযোগ সহকারে নামায পড়া উচিত। নামাযে সঠিক মনোনিবেশ করা উচিত। আল্লাহ্‌র সত্যিকার ভালবাসা যেন আপনাদের হৃদয়ে গ্রথিত এবং প্রোথিত থাকে। এ সময়টা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য কাজে লাগান। শুধু পরিবারের জন্য নামায পড়বেন না। শুধু নিজের জন্য পরিবারের জন্য নামাযে দোয়া করবেন না বরং জামা'ত এবং জাতির জন্য দোয়া করুন। *(শেষাংশ পরের সংখ্যায়)*

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir